মরু ঝড়.....
প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা:)
এর বর্ণাঢ্য জীবনভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস
নাঙ্গা তলোয়ার
২
এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

নাঙ্গা তলোয়ার

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর
বর্ণাঢ্য জীবনভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস

নাঙ্গা তলোয়ার

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল
এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনুবাদ
মাওলানা আলমগীর হোসাইন
উস্তাদ ঃ জামিয়াতুস সুন্নাহ
দক্ষিণকান্দি বাহাদুরপুর
শিবচর মাদারীপুর

মাকতাবায়ে এমদাদিয়া
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১-৩৭৮৫৩৩

নাঙ্গা তলোয়ার
এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

প্রকাশনায় ঃ
মাকতাবায়ে এমদাদিয়া
৫০,বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১-৩৭৮৫৩৩

প্রকাশক ঃ
মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

মূল ঃ
এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনুবাদ ও সম্পাদনায় ঃ
মাওলানা আলমগীর হোসাইন

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ইং

বর্ণবিন্যাস ঃ
এম. হক কম্পিউটার্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

NANGA TALOAR : Anayetullah Altamash. Published By Mawlana Muhammad Shariful Islam Maktaba-E-Emdadia. Date of Publication February 2004.

PRICE : NINETY TAKA ONLY

তাঁদের উদ্দেশে নিবেদিত-

যাঁদের তাজা খুনে
ইসলামী বিশ্বের জন্ম;
আমরা মুসলমান... ।

ভূমিকা

'নাঙ্গা তলোয়ার'-এর প্রথম খণ্ড আপনার হাতে। দ্বিতীয় খণ্ডে (উর্দু) এই ঈমানদীপ্ত দাস্তান সমাপ্ত হবে। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) ইসলামের ঐ তলোয়ারের নাম যা কাফেরদের বিরুদ্ধে চিরদিন খোলা থাকে। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাইফুল্লাহ "আল্লাহ্র তরবারী" উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি প্রাথমিক নাম করা ঐ সকল সেনাপতিদের অন্যতম যাঁদের অবদানে ইসলামের আলো দূর-দূরান্তে পৌঁছতে পেরেছে। শুধু ইসলামী ইতিহাস নয়; বিশ্ব সমরেতিহাসও হযরত খালিদ (রা.)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের কাতারে গণ্য করে থাকে। প্রখ্যাত সমরবিদ, অভিজ্ঞ রণকুশলী এবং স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞগণও হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর চাল, রণাঙ্গনের তুখোড় নেতৃত্ব এবং সমরপ্রজ্ঞা ও প্রত্যুৎপন্নমতীত্ব বিচক্ষণার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন।

প্রতিটি ময়দানেই মুসলমান ছিল কম। কাফেরদের সংখ্যা কোথাও দ্বিগুণ, কোথাও তিনগুণ ছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোম সম্রাটের সৈন্য এবং তার মিত্র গোত্রসমূহের সম্মিলিত সৈন্য ছিল ১ লাখ ৫০ হাজার। তাদের মোকাবেলায় মুসলিম সৈন্য ছিল মাত্র ৪০ হাজারের মত। শত্রুর সৈন্য সারি সুদূর ১২ মাইল প্রলম্বিত। এরমধ্যে কোথাও ফাঁক ছিল না। এর বিপরীতে মুসলমানরা শত্রুবাহিনীর দেখাদেখি নিজেদের সৈন্যদের ১১ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়। তাও প্রতি দু'জনের মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান ছিল।

শত্রুসৈন্যের বিন্যাস্ততার সারিও বৃহদাকার ছিল। সৈন্যরা একের পর এক সাজানো ছিল। একজনের পিছনে আরেকজন দাঁড়ানো। যেন একটি প্রান্তের পিছে আরেক প্রান্ত খাঁড়া। এর বিপরীতে মুসলমানদের সৈন্য বিন্যাস্ততার গভীরতা ছিল না বললেই চলে।

ইতিহাস মুক। সমরবিশেষজ্ঞগণ বিস্মিত। সকলের অবাক জিজ্ঞাসা, ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানরা রোমীয়দের কিভাবে পরাজিত করল? রোমকদের সেদিন চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল। এ অবিশ্বাস্য ঘটনার পর বাইতুল মুকাদ্দাস পাকা ফলের মত মুসলমানদের ঝুলিতে এসে পড়েছিল।

এটা ছিল অভূতপূর্ব জঙ্গীচাল এবং সমর কুশলতার ফল। ইয়ারমুক যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) যে সফল চাল চেলেছিলেন আজকের উন্নততর রাষ্ট্রের সেনা প্রশিক্ষণে গুরুত্বের সাথে তা ট্রেনিং দেয়া হয়।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) এটা মানতে রাজি ছিলেন না যে, দুশমনের সৈন্যসংখ্যা বেশী হলে এবং তাদের রণসম্ভার অত্যাধুনিক ও উন্নত হলে আর মুসলমানরা সংখ্যায় কম হলে শত্রুর মুখোমুখী হওয়া উদ্বেগজনক ও আত্মঘাতী হবে। এমন ঘটনাও তার বর্ণাঢ্য জীবনে ঘটেছে যে, তিনি সরকারী নির্দেশ এড়িয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করে শ্বাসরুদ্ধকর বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। এটা তাঁর প্রগাঢ় ঈমান এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের ফসল ছিল। ইসলাম এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি অগাধ ভালবাসার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ছিল।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব ছিল আরো অসাধারণ, নজিরবিহীন। যে কোন পাঠক শ্রোতাই তাতে চমৎকৃত হয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-কে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করলে তিনি একটুও বিচলিত কিংবা ভগ্নাহত হননি। খলিফার নির্দেশের সাথে সাথে সেনাপতির আসন থেকে নেমে গেছেন সাধারণ সৈনিকের কাতারে। সেনাপতি থাকা অবস্থায় যেমন শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেছেন, সৈনিক অবস্থায় তার থেকে মোটেও কম করেননি। ইয়ারমুক যুদ্ধশেষে হযরত উমর (রা.) এক অভিযোগে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-কে মদীনায় তলব করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মদীনায় এসে উপস্থিত হন এবং আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ান। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সেনাপতির সাথে 'অসেনাপতিসুলভ' আচরণ করলেও হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া এমন শান্ত ছিল যে, হযরত উমর (রা.)-কে এরজন্য একটুও চাপের সম্মুখীন হতে হয় না। তিনি অবনত মস্তকে খলিফার নির্দেশ শিরোধার্য বলে মেনে নেন। প্রদত্ত শাস্তি অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেন।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) বরখাস্তের দরুন দুঃখিত হন ঠিকই কিন্তু তাই বলে খলিফার বিরুদ্ধে তিনি টুশব্দ করেননি। খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার কল্পনাও মাথায় আনেননি। নিজস্ব বাহিনী তৈরী করেননি। পৃথক রণাঙ্গন সৃষ্টি করেননি। তিনি এমন কিছু করতে চাইলে পুরো সেনাবাহিনী ছিল তাঁর পক্ষে। জাতির চোখে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইতিমধ্যে দু'টি বিশাল বিশাল সমরশক্তিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়ায় তার জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। এক ছিল পরাক্রমশালী ইরানী শক্তি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অপর পরাক্রমশালী রোমক শক্তি। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) তাদেরকে চরম নাকানি-চুবানি খাইয়ে পরাজিত করে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমা ইরাক এবং সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও খেলাফতের প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তিনি খলিফার সিদ্ধান্তে রুখে দাঁড়ান না। তিনি নিজের সম্মান-মর্যাদার কথা বিবেচনা না করে মাননীয় খলিফার মর্যাদা সমুন্নত রাখেন।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর পরিচয়, ইসলামের প্রতি তাঁর অবদান এবং বর্তমান মুসলমানরা তাঁর থেকে কি আদর্শ গ্রহণ করতে পারে—বক্ষমাণ উপন্যাসে পাঠক তা মর্মে মর্মে অনুধাবন করবেন।

ইসলামী ইতিহাস অনেক সময় বাড়াবাড়ির সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার কোন কোন ঘটনায় পদস্খলনের শিকার হয়েছেন। একই ঘটনা একাধিকরূপে চিত্রিত হয়েছে। ফলে তা হতে সত্য ও বাস্তব তথ্য আহরণ পাঠকের জন্য গলদঘর্মের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।...

এ উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা সত্য-সঠিকরূপে পেশ করতে আমরা বহু গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি, সম্ভাব্য যাচাই-বাছাই করেছি এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা লিখেছি। মাঝে মাঝে এমন স্থানে এসে হোচট খেয়েছি যে, কোন্‌টা বাস্তবভিত্তিক আর কোন্‌টা ধারণা নির্ভর—তা শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য-সূত্রের উপর ভিত্তি করে বাস্তবতা উদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছি। এ কারণে মতান্তর ঘটবে; আর তা ঘটাই স্বাভাবিক। তবে এ মতবিরোধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অপ্রসিদ্ধ ঘটনায় গিয়ে প্রকাশিত হবে মাত্র।

যে ধাঁচে এ বীরত্ব-গাঁথা রচনা, তার আলোকে এটাকে কেউ উপন্যাস বললে বলতে পারে কিন্তু এটা ফিল্মী স্টাইল এবং মনগড়া কাহিনী ভরপুর বাজারের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত নয়। এর পাঠক উপন্যাসের চাটনীতে 'ঐতিহাসিকতার খাদ্য' গলধঃকরণ করবেন গোগ্রাসে। এতে ঐতিহাসিকতা বেশী, ঔপন্যাসিকতা কম।

এটা কেবল ইতিহাস নয়, ইসলামী ঐতিহ্যের অবয়ব। মুসলমানদের ঈমানদীপ্ত দাস্তান। পূর্বপুরুষদের গৌরব-গাঁথা এবং মুসলিম জাতির জিহাদী জযবার প্রকৃত চিত্র। পাঠক মুসলিম জাতির স্বকীয়তা জানবেন, সাহিত্য রস উপভোগ করবেন এবং উপন্যাসের শিহরণ অনুভব করবেন।

বাজারের প্রচলিত চরিত্রবিধ্বংসী উপন্যাসের পরিবর্তে সত্যনির্ভর এবং ইসলামী ঐতিহ্যজাত উপন্যাস পড়ুন। পরিবারের অপর সদস্যদের পড়ান। মানুষের হাতে হাতে তুলে দিন মুসলিম জাতির এ গৌরবময় উপখ্যান।

এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ
লাহোর, পাকিস্তান।

প্রকাশকের কথা

ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ এখন আর আমাদের কাছে অপরিচিত নন। নিয়মিত পাঠক মহলের কাছে এই নামটি যথেষ্টই পরিচিত। শুধু পরিচিতি ছিল না এই 'নাঙ্গা তলোয়ার' নামের বইটি। খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-এর নাম জানে না এমন মুসলমান পাওয়া দুস্কর। মুসলিম ইতিহাসে এই বীরের কীর্তিময় ইতিহাস কম বেশী সকলেরই জানা।

সেই ইতিহাস, সেইসব কীর্তিগাঁথা জানা অজানা সব তথ্য তুলে এনেছেন এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ এই 'নাঙ্গা তলোয়ার' বইটিতে।

হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) ছিলেন বিধর্মী। কিন্তু তাঁর হৃদয়, মন সবই ছিল সত্য পিপাসু। তিনি নিজের জ্ঞান, অনুসন্ধিৎসু মন সবই বিলিয়ে দিয়েছেন সত্যের অন্বেষণে। এক সময় ঠিকই তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্যে এসে কালেমা পড়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে নিজেকে ধন্য করেছিলেন।

এই বইটিতে সেই বীর সেনানীর জীবনীর সামান্য মাত্র আলতামাশ তাঁর দক্ষ শৈল্পিক হাতে তুলে ধরেছেন।

বইটি তাড়াহুড়ো করে পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ায় হয়তো কোন ভুলক্রটি থেকে যেতে পারে। স্বল্প সময়ে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি সুন্দর করতে। তবুও ভুল রয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। পাঠকদের কাছে সবিনয় অনুরোধ আপনাদের দেয়া সঠিক তথ্য আমরা দ্বিতীয় সংস্করণে শোধরানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্। পাঠকদের প্রতি আমাদের এই প্রত্যাশা।

মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

২৪.০২.০৪ ইং

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

- মুজাহিদে আযম হযরতুল্ আল্লাম
- শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর প্রকাশিত অন্যান্য বই
- ভুল সংশোধন
- আদর্শ মুসলিম পরিবার
- তাছাউফ তত্ত্ব
- জীবন পাথেয়
- শত্রু থেকে হুঁশিয়ার
- হজ্জের মাসায়েল
- মসজিদ ও জীবন্ত মসজিদ
- হালাল হারাম
- অসৎ পীর ও অসৎ আলেম
- তারীখে মিল্লাত খেলাফতে বনু উমাইয়া
- নাঙ্গা তলোয়ার প্রথম খণ্ড

॥ বাহান্ন ॥

"লাঈছ বিন মোশানের উপস্থিতিতে ব্যাপারটা খুলে বললে ভাল হয় না?" ইউহাওয়া বলে—"এ ব্যাপারে ঐ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির অবদানই বেশী।"

"ঐ বুড়ো যাদুকরকে এখন কিভাবে ডেকে পাঠাব?" কা'ব বিন আসাদ বিরক্তির ভাব নিয়ে বলে—"তুমি বলে যাও। তোমার উপর আমাদের আস্থা রয়েছে।"

"তিনি এখানেই আছেন।" বয়োবৃদ্ধ ইহুদী নড়েচড়ে বসে বলে—আমরা তাকে সাথে করেই এনেছি। শুধু তাই নয়, মুহাম্মাদকে যে হত্যা করবে তাকেও নিয়ে এসেছি। আর আমরা অপেক্ষা করতে পারি না। আমাদের বুকভরা আশা ছিল, কুরাইশ, গাতফান ও অন্যান্য সহযোগী গোত্রগুলো সম্মিলিতভাবে ইসলামের নাম-নিশানা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে চিরতরে মুছে দিবে। কিন্তু আশা হতাশায় পরিণত হয়েছে। প্রতিটি রণাঙ্গনে তারা শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে। আমরা তাদেরকে মদীনা আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেছিলাম। তারা এ পর্যন্ত এসেও চরম কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে পালিয়ে যায়।...ইহুদীদের খোদার শপথ। মুসলমানদের উপর পশ্চাৎ হতে আক্রমণ না করে তুমি অত্যন্ত অনুচিত কাজ করেছ, কা'ব!"

"ইতিপূর্বে তার কারণ দর্শিয়েছি।" কা'ব বিন আসাদ বিব্রত হয়ে বলে।

"কারণ সঠিক ছিল না ভুল?" বয়োবৃদ্ধ ইহুদী বলে—"সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। আর আমরা কুরাইশদের বিজয়ের অপেক্ষা করতে পারি না।" সাথে সাথে ইউহাওয়াকে লক্ষ্য করে বলে—"লাঈছ বিন মোশানকে ডাক।... অপর ব্যক্তি আপাতত বাইরে থাকুক।"

ইউহাওয়া কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই লাঈছ বিন মোশানকে নিয়ে ফিরে আসে। ৭০ থেকে ৮০ বছরের মাঝামাঝি বয়সের এক বয়োবৃদ্ধ লোক ছিল সে। তার মাথার চুল এবং দাড়ি দুধের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। দাড়ি ছিল বেশ প্রলম্বিত। চেহারা রক্তিমাভ। লাল-সাদায় মাখামাখি; গোধুমবর্ণ। পৌরুষদীপ্ত উজ্জ্বল কান্তি। ভরাট শরীর। তবে শরীরের ভাঁজে ভাঁজে বাধ্যর্কের

ছাপ পরিলক্ষিত। উটের রঙের আলখেল্লা পরিহিত ছিল সে। হাতে শোভা পাচ্ছিল বার্ধক্যের বন্ধু 'লাঠি'। লাঠির উর্ধ্বভাগ শিল্প-নৈপুণ্য সমৃদ্ধ ছিল। লাঠি মাটিতে রেখে দিলে মনে হত জ্যান্ত সাপ ফণা তুলে আছে।

ইহুদী পরিমণ্ডলে লাঈছ বিন মোশান জাদুকর হিসেবে খ্যাত ছিল। নযরবন্দী এবং জাদু প্রদর্শনে তার বিশেষ দক্ষতা ছিল। মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী কোন এক বিজন গ্রামে সে বাস করত। তার সম্পর্কে অনেক ধরনের কথা সমাজে প্রচারিত ছিল। মৃতকে স্বল্প সময়ের জন্য জীবিত করা ছিল এর মধ্যে অন্যতম। যে কোন ধরনের পুরুষ কিংবা মহিলাকে আয়ত্তাধীন ও ভক্ত করার সামর্থ্য সে রাখত। ইহুদীরা তাকে বিশপ ও পাদ্রী বলে মান্য করত। সে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বিচক্ষণ এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিল।

সে কক্ষে প্রবেশ করলে সবাই তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায়। সে আসন গ্রহণ করলে এক এক করে সবাই বসে পড়ে।

"মোশানের বংশ-মর্যাদা সম্পর্কে কার না জানা আছে?" কা'ব বিন আসাদ বলে—"ইহুদীদের খোদার শপথ! আমাদের মধ্য হতে আপনাকে ডেকে পাঠানোর সাহস করতে পারে না। ইউহাওয়া মনে হয় আপনাকে নিয়ে এসেছে।"

"আমি পয়গম্বর নই কা'ব!" লাঈছ বিন মোশান বলে—আমি জাতীয় আকর্ষণীয় শব্দ শুনতে অভ্যস্ত নই। সম্মান এবং মর্যাদা দেখানোর সময়ও নেই। কেউ না ডাকলেও আমাকে আসতে হত। তোমরা গুরুদায়িত্ব পালনে অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছ। তোমাদের তুলনায় এই মেয়েটি শতগুণে ভাল। কারণ, যে কাজ তোমাদের করার ছিল সে নিজেই তা সম্পন্ন করেছে।"

"শ্রদ্ধাপদ ইবনে মোশান!" কা'ব বিন আসাদ বলে—"আমরা এখনও এমন চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়ে ভাবিনি। মুহাম্মাদকে হত্যার মত ভয়াবহ সিদ্ধান্ত নিলেও কোনক্রমে ইউহাওয়াকে এ কাজে ব্যবহার করতাম না। এমন অসাধারণ সুন্দরী এবং যুবতী নারী আমরা ব্যবহার করতে পারি না।"

"কেন নয়?" লাঈছ উদ্বেগের সাথে জানতে চায়—"সারা বিশ্বে ইহুদীদের খোদার রাজত্বের কথা কি ভুলে গেছ?...দাউদের তারকার শপথ, সমগ্র মানব জাতির উপর বনী ইসরাঈলের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের বিরাট কুরবানী দেয়া লাগবে। মানুষের স্বভাবজাত দুর্বল পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করে করে টার্গেট নিতে হবে। একজন পুরুষ কি চায় জান? ... একদিকে ইউহাওয়া আর অপরদিকে উন্নতজাতের বিশটি ঘোড়া এবং বিশজন গোলাম দাঁড় করিয়ে দিয়ে

কাউকে যদি ইচ্ছেমত গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হয়, তাহলে দাউদের তারকার শপথ দিয়ে বলতে পারি, সে ঘোড়া এবং গোলামের পরিবর্তে ইউহাওয়াকেই গ্রহণ করবে।"

কক্ষে কিছুক্ষণের জন্য পিনপতন নীরবতা নেমে আসে। কারো মুখে কথা সরে না। বিস্ফারিত নেত্রগুলো চেয়ে থাকে লাঈছের দিকে।

"আমার অনুমান তোমরা আমার কথার মর্মার্থ বুঝতে পারনি।" লাইছ বলে—"তোমাদের মন-মগজে নারী ও তার কৌমার্যের পবিত্রতা বদ্ধমূল হয়ে আছে।... আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। লাজ-লজ্জার সাথে পবিত্রতার কোন সম্পর্ক নেই। এটি একটি মোক্ষম হাতিয়ার। শত্রুকে পঙ্গু ও তার চিন্তাশক্তি বিভ্রান্ত করতে এ অস্ত্রের জুড়ি নেই। শত্রুকে অকেজো করতে এ হাতিয়ার আমাদের ব্যবহার করতেই হবে। সৎকাজ কাকে বলে? অসৎ কাজের সংজ্ঞা কি?... আমি জানি, তোমরা জবাবে কি বলবে। অবশ্যই তোমাদের জবাব সঠিক। তবে বিশ্বের আনাচে-কানাচে ইহুদীবাদের মর্মবাণী পৌঁছে দিতে চাইলে 'সৎ-অসৎ' এর অর্থ তখন বদলে যাবে। মুহাম্মাদ অশ্লীলতা ও নাশকতার মূলোৎপাটনে গলদঘর্ম। আমাদেরকে তা জিইয়ে রাখতে হবে এবং অভিনব পন্থায় নিত্যনতুন অশ্লীলতা ও নাশকতা সমাজে চালু করতে হবে। তাই বলে আমরা নিজেরা নাশকতামূলক কাজে জড়িয়ে পড়ব না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিজেদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করতে চাইলে অইহুদীদেরকে দুনিয়াতেই জান্নাত দেখাতে হবে। জান্নাতের হুর তাদের সামনে পেশ করতে হবে। দামী মদ পান করাতে হবে। মানুষের মাঝে পশুসুলভ প্রবৃত্তি রয়েছে। এই পশুত্ব কয়েকগুণে বৃদ্ধি করতে হবে। ভাল-মন্দের বিচার এখন নয়। এখন একমাত্র লক্ষ্য, ইহুদীদেরকে বিশ্বের ড্রাইভিং সিটে বসানো। এর জন্য যা যা করা দরকার সবই আমাদের করে যেতে হবে। চাই তা যতই মন্দ ও কুরুচীপূর্ণ হোক না কেন। একটু থেমে সে ইউহাওয়ার দিকে তাকায় এবং বলে—"ইউহাওয়া! তাদেরকে খুলে বল, ব্যাপারটা ভাল করে বোঝাও।"

ইউহাওয়ার ঠোঁটে মুচকি হাসির আভা খেলে যায়। পরিকল্পিত ভঙ্গিতে ওষ্ঠদ্বয়ের ওঠা-নামায় সে আভা দ্যুতিময় হয়ে কণ্ঠকে জ্যোতির্ময় ও মোহনীয় করে তোলে। এক দুর্বার আকর্ষণে উপস্থিত সবাই ইউহাওয়ার কমনীয় কান্তি ও হুররূপী চেহারা পানে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে। কারো চোখে পলক পড়ে না। ইউহাওয়া বলতে শুরু করে তার কাহিনী।

॥ তেপ্পান্ন ॥

ঘটনার সূত্রপাত কয়েকমাস পূর্বে মক্কা হতে হয়। ইউহাওয়া লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে শুনাতে থাকে যে, হযরত খালিদ, ইকরামা ও সফওয়ান-তিন নামকরা কুরাইশ সেনাপতিকে সে স্বীয় যৌবন ও রূপ-জৌলুসের জাদুতে পৃথক পৃথকভাবে বন্দী করতে চায়। তাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সৃষ্টিরও চেষ্টা করে। কিন্তু তিনজনের একজনও তার জালে বন্দী হয় না। কাউকে সে ফুসলিয়ে প্ররোচিত করতে পারে না। তিন সেনাপতির অন্তরে কুরাইশ দলপতি ও সর্বাধিনায়ক আবু সুফিয়ানের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টিরও জোর প্রয়াস চালায়।

"... কিন্তু খালিদ মানুষ নয়, পাথর।" ইউহাওয়া বলে—"সে আমাকে স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানও করে না আবার ঐ আকর্ষণও দেখায় না, আমি যার আশাবাদী ছিলাম। আমার বিশ্বাস, ইকরামা এবং সফওয়ানের উপর খালিদেরই প্রভাব বিদ্যমান। এই তিন সেনাপতি সমর প্রেমিক। যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া আর কিছুই তারা বোঝে না। দ্বিতীয় কোন বিষয় চিন্তা করতেও নারাজ।"

ইউহাওয়া হাল ছাড়ে না। চেষ্টা অব্যাহত রাখে। হযরত খালিদ থেকে জলদি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। কারণ তার চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতা জুড়ে একমাত্র এ চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে, মুসলমানদেরকে সরাসরি রণাঙ্গনে পরাজিত করতে হবে এবং যুদ্ধবন্দী কিংবা লড়াইরত অবস্থায় রাসূল (সা.)-কে হত্যা করতে হবে।

একদিন ইউহাওয়া মক্কা হতে চার মাইল দূরের এক গ্রামে যায়। শেষ বিকেলে সেখান থেকে রওনা হয়। তার সাথে আরো দুইটি মেয়ে এবং তিনজন পুরুষ ছিল। এদের সবাই ইহুদী। দু'টি ঘোড়ার গাড়িতে সওয়ার হয়ে তারা ফিরে চলে। অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই ভয়াবহ মরু ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়। এতে বালুর টিলাগুলো হ্রাস পেতে পেতে এক সময় পূর্ণ নিঃশেষ ও অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। এ ঝড়ের গতি এমন তীব্রতর হয় যে, দেহের কোন স্থান খোলা থাকলে উৎক্ষিপ্ত বালু সেখানে ক্ষেপণাস্ত্রের ন্যায় আঘাত করত। বালুকণা চামড়া ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যেত। উট-ঘোড়া নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে এদিক-ওদিক ছুটে পালাত।

জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত উঁচু একটি কৃত্রিম প্রাচীর আচমকা তীব্রগতিতে উত্থিত হয়ে আঘাত হানে এবং প্রাচীরটি মুহূর্তে ইহুদীদের বহনকারী ঘোড়ার গাড়িটিকে গ্রাস করে নেয়। আকাশ রক্ত-রাঙা হয়ে ওঠে। সমুদ্রে সৃষ্ট তুফানের প্রবল উর্মিমালা যেমন জাহাজের উপর আছড়ে পড়ে তাকে ডুবিয়ে দেয়ার উপক্রম করে, ঠিক তেমনি ঘূর্ণির প্রবল ঝাপটা শক্তিশালী থাবা হয়ে তাদের ভূপাতিত ও

ধরাশায়ী করতে থাকে। বালুর টিবিগুলোর মূলোৎপাটন করে চলে। মরু ঘূর্ণিবায়ু চলাকালে থেমে দাঁড়িয়ে থাকা বিপর্যয় ডেকে আনে। বেলচা দ্বারা বালু নিক্ষেপে যেমন বালুর স্তূপ জমে তেমনি উৎক্ষিপ্ত বালু শরীরে আছড়ে পড়ে নিচে ভূপাতিত হয়ে জমা হয়। এভাবে বালু জমে কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে বালুর স্তূপ ও ঢিবি হয়ে যায়। মানুষকে কেন্দ্র করে এই স্তূপ গড়ে ওঠায় সে ব্যক্তি কৃত্রিমভাবে তার মধ্যে জ্যান্ত দাফন হয়ে যায়। কিন্তু সে জীবিত থাকে না। বালুর চাপে দম বন্ধ হয়ে মারা যায়।

"ঘূর্ণিঝড় আমাদের পার্শ্বদেশ থেকে আসে।" ইউহাওয়া শোনায়—"ঘোড়া বালুভরা ঝড় সহ্য করতে না পেরে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়। ঘূর্ণির দিকে মুখ করে ঘোড়াগুলো গাড়ি নিয়ে ছুটতে থাকে। অস্বাভাবিক এ পথে ছোট বড় খানা-গর্ত পড়ে। ঘোড়ার গাড়ি থেকে থেকে জোরে লাফিয়ে উঠতে এবং দুলতে থাকে। আরোহীসহ গাড়ি ঘোড়ার দয়া-মায়ার উপর উড়ে চলতে থাকে। গাড়ির অভ্যন্তরে এভাবে বালুর বৃষ্টি হতে থাকে যে, নিজেকে নিজে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না।...

"এক স্থানে এসে গাড়ির এক সাইডের চাকা গভীর গর্তে পড়ে।" ইউহাওয়া একটু থেমে পুনরায় সেই ভয়াল স্মৃতি মন্থন করে—"অথবা অন্য সাইডের চাকা অস্বাভাবিক উঁচু স্থানে উঠে যায়। গাড়ি এক দিকে এত উঁচু হয়ে যায় যে, কাত হয়ে উল্টে যাওয়াটা নিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু গাড়ি উল্টে না। তবে গাড়ি তীব্র ঝাঁকুনি খাওয়ায় উঁচু হয়ে যাওয়া সাইড দিয়ে আমি বাইরে ছিটকে পড়ি। গাড়ি নিজ গতিতে ছুটে চলে যায়। গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আমি গড়াগড়ি খেতে থাকি। এক সময় সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াই এবং সাথীদের নাম ধরে ডাকতে থাকি। কিন্তু ঝড়ের তীব্র ঝাপটা এবং শো শো আওয়াজে ডাক আমার নিজের কান পর্যন্তই পৌছে না। সাথীরা সম্ভবত আমার পড়ে যাওয়া খেয়াল করতে পারে না। আর খেয়াল করলেও কারো বুকের পাটায় এই হিম্মত ছিল না যে, আমার নিঃসঙ্গতা দূর করতে সেও গাড়ি হতে লাফিয়ে পড়বে।"...

"এমন ভীত-সন্ত্রস্ত আমি আর কখনো হইনি।" ইউহাওয়া চেহারায় কৃত্রিম উদ্বেগ সৃষ্টি করে বলে—"এবং এমন ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে কখনো পতিত হইনি। যেমনি ঝড় তেমনি অন্ধকার, কিছুই চোখে দেখা যাচ্ছিল না। আমার আশেপাশে কোন রাস্তাও ছিল না। ঘোড়া সঠিক রাস্তা ছেড়ে যে এদিক-ওদিক চলছিল তাও আমার জানা ছিল। আমি নিরুপায় হয়ে মুখ কাপড়ে ঢেকে বাতাসের গতি লক্ষ্যে চলতে থাকি। হাঁটছিলাম কিন্তু বাতাসের দাপটে পা মাটিতে ঠিকমত রাখতে পারছিলাম না।"

॥ চুয়ান্ন ॥

ঘূর্ণিঝড় ইউহাওয়াকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে চলে। হঠাৎ ঝড়ের শো শো আওয়াজ বিকটরূপ ধারণ করে। ইউহাওয়া ভয়ে নিচের দিকে চলে। ঝড় তাকে দ্রুত নিয়ে যায়। এখানে এসে একটি দেয়ালের সাথে ধাক্কা খায়। এটি ছিল বালুকাময় মাটির দেয়াল। ইউহাওয়া দেয়াল ধরে ধরে সামনে চলে। এটা নিম্নভূমি থাকায় এখানে মাটির টিলা এবং ডাল-পালাবিহীন নেড়ে মরুবৃক্ষ ছিল। পরিবেশ ও প্রকৃতিগত কারণে ঝড়ের আওয়াজ অনেক মেয়েলোকের একযোগে চিৎকারের মত শোনা যায়। মাঝে মাঝে এমন আওয়াজও শোনা যায় যার সাথে ঝড়ের আওয়াজের কোন মিল ছিল না। মানুষের আওয়াজ বলেও মনে হয় না। প্রেতাত্মা ও হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের মত ছিল এ আওয়াজ।

ইউহাওয়া নিজেকে অত্যন্ত নির্ভীক এবং অসীম সাহসী মনে করলেও এখানে এসে ভয়ে কেঁদে ওঠে। তার বিশ্বাস ছিল, এক সময় ঘূর্ণিঝড় থেমে যাবে। সাথে সাথে এ কথাও সে ভুলে না যে, কোন পুরুষের হাতে পড়লে সে তাকে তার বাড়িতে নয়; বরং নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে। এ সম্ভাবনাও তাকে অস্থির করে তোলে যে, সুযোগ বুঝে কেউ তাকে নষ্ট করে তারপর হত্যা করে ফেলবে। রাত ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছিল। বাঘ-ভল্লুকের আশঙ্কা ছিল আলাদা। সমস্ত উদ্বেগ বাদ দিলেও এ উৎকণ্ঠা এড়ানোর কোন উপায় ছিল না যে, মক্কার সাধারণ রাস্তা ছেড়ে তার বাহন ঘোড়ার গাড়ি মরুভূমিতে চলে আসে এবং পরে বাতাসের তীব্রতায় সে আরো দূরে সরে গেছে। বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে একবার পথ হারালে দ্বিতীয়বার পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হত না। পথহারা মুসাফিরের শেষ পরিণতি হতো মৃত্যু। ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত হওয়ার কারণে নয়, পিপাসার তীব্রতায় ছটফট করে মারা যেত।

উটের বিড় বিড় আওয়াজ হঠাৎ ভেসে আসে। তার আতঙ্ক আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই বলে মনকে প্রবোধ দেয় যে, এটা ভিন্ন কিছু নয়; বরং ঘূর্ণিঝড়েরই আওয়াজ মাত্র। খালি চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মাটির দেয়ালে হাত রেখে রেখে সে সামনে এগুতে থাকে। দেয়ালটি ছিল মূলত একটি বড় টিলা, যা কিছুদূর গিয়ে বাঁক খায়। উটের আওয়াজ পুনরায় শোনা যায়। এবারের এ আওয়াজ অতি নিকট থেকে আসে। এত নিকট থেকে যে, ইউহাওয়া প্রথমে আঁৎকে উঠে দু'কদম পিছনে সরে আসে। সে নিশ্চিত হয়ে যায় যে, এটা উটেরই আওয়াজ।

বিরান মরুভূমিতে মানুষ ছাড়া উটের কল্পনাও করা যায় না। একটি উটের সাথে কমপক্ষে দু'তিনজন লোক অবশ্যই থাকবে। এখানে যারা আছে তারা তার

হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়াটা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ, সময়টা ছিল বড় খারাপ। ধর্ষণ, খুন, লুণ্ঠন চলত অবাধে। এসব ভেবে ইউহাওয়া সেখান থেকে কেটে পড়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু কোন্ দিকে যাবে? কোথায় যাবে? এই বিজন মরুভূমিতে কে তাকে একটু আশ্রয় দিবে? এদিকে ঘূর্ণিঝড় টিলা এবং মৃত্যুপ্রায় বৃক্ষের মাঝ দিয়ে গমনকালে ভয়ঙ্কর আওয়াজ সৃষ্টি করে চলছিল। মাটি ইউহাওয়ার পা শক্ত করে এঁটে ধরে। যাদের সাথে ঘোড়ার গাড়িতে সে চলছিল এ সময়ে এসে আরেকবার তাদের উপর তার গোস্বা হয়। তার রাগের কারণ, জ্যান্ত একটা মানুষ পড়ে গেল অথচ পাশেই বসে থাকা একজনেরও খবর হলো না।

॥ পঞ্চান্ন ॥

একটি অদৃশ্য শক্তি তাকে ধাক্কা দিয়ে একদিকে নিয়ে যায়। সেখান থেকে দেয়ালের মত খাড়া একটি টিলা ক্রমে ভিতর দিকে চলে গিয়েছিল। এটি চমৎকার একটি গিরি এলাকা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে স্থানটি ঘূর্ণিঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পায়। এখান থেকে তিন-চার গজ দূর পর্যন্ত ইউহাওয়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু কোন উট তার নজরে পড়ে না, দেয়ালের গা ঘেঁষে সে আরো ভিতরে চলে যায়। দু'কদম এগুতেই একটি গিরিমুখ ভেসে ওঠে। কিন্তু গর্তের মধ্যে যেতে তার সাহস হয় না। সে ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে।

"ভিতরে এস।" এক ব্যক্তির ডাক তার কর্ণকুহরে গিয়ে আঘাত করে— "বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ভাই, ভিতরে এস।"

ইউহাওয়া নিজের অজান্তে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে এবং পিছে ফিরে দৌড় দেয়। কিন্তু গিরি এলাকা থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে ঘূর্ণিবায়ু তার শরীর লক্ষ্য করে বেলচা দিয়ে বালু নিক্ষেপের মত বালু ছুঁড়ে মারে। ইউহাওয়া ঘাবড়ে পিছনে সরে আসে। এরই মধ্যে গুহা হতে তার সন্ধানে আগত এক ব্যক্তি ঠিক তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

"একি! তুমি মহিলা?" লোকটি উদ্বিগ্ন হয়ে আরো জিজ্ঞাসা করে—"তুমি কি একা? একা তো হতে পার না।"

"আমার সাথে চারজন পুরুষ আছে।" ইউহাওয়া কাপড়ে চেহারা ঢাকতে ঢাকতে বলে—তাদের কাছে ঘোড়া আছে। তারা সকলেই তলোয়ার ও বর্শাধারী।

"তারা কোথায়?" লোকটি জানতে চায়—"তুমি তাদের থেকে পৃথক হয়ে এদিকে কেন এসেছ?...তাদের এখানে নিয়ে আস। গুহাটি বড়ই চমৎকার। সকলেই আরামে সেখানে বসতে পারব।"

ইউহাওয়া জায়গা থেকে নড়ে না। লোকটি তিন তিনবার তার সাথীদের এখানে আনতে বলে। কিন্তু ইউহাওয়ার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। সে সাথীদের ডাকতে

যায়ও না আবার কথাও বলে না। এতে তার সন্দেহ ক্রমে দানা বেঁধে একসময় বদ্ধমূল হয়ে যায়। লোকটি হঠাৎ ইউহাওয়ার উড়না ধরে টান মেরে চেহারা খুলে ফেলে।

"তুমি অমুক ইহুদীর মেয়ে নও?" লোকটি ইউহাওয়ার পিতার নাম ধরে জানতে চায়—"তুমি একা?"

"হ্যাঁ, আমি একলা।" ইউহাওয়া কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে—"আমাকে দয়া কর।"

এরপর ইউহাওয়া তার নিঃসঙ্গ হওয়াসহ বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলে। এখানে কিভাবে পৌঁছল তাও অবগত করায়।

"আমার সাথে এস।" লোকটি এ কথা বলে তার হাত ধরে সাথে করে নিয়ে চলে।

"একটু দাঁড়াও!" ইউহাওয়ার কণ্ঠে অনুরোধ ঝরে পড়ে—"তোমরা মোট কতজন?...আমার প্রতি তোমরা দয়া করবে তো?...আমার ধারণা মতে তোমরা কুরাইশী।"

"এখানে আমি একা।" লোকটি বলে—"ঠিকই বলেছ, আমি কুরাইশী। তোমার প্রতি দয়াই করছি।"

"অনেকবার আমি তোমাকে মক্কায় দেখেছি।" ইউহাওয়া কিছুটা সাহস সঞ্চার করে বলে—"কিন্তু তোমার নাম আমার জানা নেই।"

আমার নাম যারীদ বিন মুসাইয়িব।... কথা বাড়িও না। আমার সাথে এস।"

"পরে তো তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে?" ইউহাওয়া ধরা গলায় জানতে চায়—"আমি তোমাকে অসন্তুষ্ট করব না।"

॥ ছাপ্পান্ন ॥

ইউহাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের মাঝে খেই হারিয়ে ফেললেও উটের আওয়াজ ঠিকই চিনেছিল। এই উটটি ছিল যারীদের। উট বাইরে বসিয়ে যারীদ অধিকতর নিরাপদ হিসেবে একটি গুহাকে বেছে নিয়ে সেখানে বসে ঝড় থামার অপেক্ষা করে। ইউহাওয়া দুর্বিপাকে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পৌঁছলে দু'জনের এই আলাপচারিতা ও কথোপকথন হয়। যারীদ ইউহাওয়াকে গুহায় নিয়ে যায়। দীর্ঘ শরীর, হৃষ্ট-পুষ্ট এবং আকর্ষণীয় চেহারার এক টগবগে যুবক যারীদ। সে ইউহাওয়াকে গুহায় নিয়ে গিয়ে পানি পান করায়। এরপর খেজুর ভর্তি একটি থলে তার সামনে রেখে দেয়।

"চুপ করে বসে থাক।" যারীদ বলে, "ঝড়ের গতি কমছে। আমি তোমাকে অবশ্যই বাড়ি পৌঁছে দিব।" একটু থেমে সে ইউহাওয়াকে জিজ্ঞাসা করে—"আমাকে অসন্তুষ্ট করবে না, একথা কেন বলছিলে?

"বাড়িতে পৌঁছে দেবার বিনিময় হিসেবে।" ইউহাওয়া বলে—"এ ছাড়া বিনিময় হিসেবে আর কিইবা দিতে পারি আমি?"

"কোন বিনিময় নিব না।" যারীদ বলে—"আমি তাদের মত নই। লড়াই করে তোমাকে ছিনিয়ে আনলে তুমি আমার পুরস্কার হতে। কিন্তু এখানে তুমি আমার দয়া ভিক্ষা করেছ। দয়ার বিনিময় নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

ইউহাওয়া তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। যারীদ সামনে কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ে। ইউহাওয়া তার সাথে হাল্কা কথাবার্তা বলে। একটু পরেই তার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, যারীদের মনে কোন কুমতলব কিংবা দুরভিসন্ধি নেই। এমনকি যারীদ তার সাথে প্রাণখুলেও কথা বলে না। ইউহাওয়া নিরাপদ সাথী পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যারীদের মত টগবগে যুবক তার নজরকাড়া সৌন্দর্যে এতটুকু মোহিত না হওয়ায় সে উদ্বিগ্নও হয়ে ওঠে। এটাকে তার রূপের পরাজয় মনে করে।

"যারীদ!" ইউহাওয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ওঠে—"আমি কি দেখতে সুন্দর নই? আমাকে তোমার পছন্দ হয় না?"

যারীদ তার কথা শুনে জোরে হেসে ওঠে শুধু; মুখে কিছু বলে না।

"হাসছ কেন?" ইউহাওয়া অসহায় ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে—"তোমার হাসি দেখে আমার পিলে চমকে গেছে।"

"খোদার কসম! তুমি অত্যন্ত সুন্দরী।" যারীদ এবার বলে—"তুমি আমার পছন্দসই ঠিকই। কিন্তু যে বিপদ কবলিত অবস্থায় এবং যে মরুচরে তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ সেখানে অন্যায় কোন কিছু করা আমি ভাল মনে করি না।... আমার পৌরুষকে ক্ষেপিয়ে তুলো না। তোমার দেহ আমাকে আকর্ষণ করে ঠিকই কিন্তু শুধু এই ভয়ে আমি আত্মসংযম অবলম্বন করেছি যে, আমার দেবতা এ অপরাধে আমাকে অভিসম্পাত করবে যে, এক বিপদগ্রস্ত নারীকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। অতঃপর তার দেহকে নিজের উপভোগ্য মনে করেছি।

যারীদ এরপরে আর কোন কথা বলে না। ইউহাওয়ার অন্তর থেকে ভয় দূর হতে থাকে। যারীদকে তার বড় ভাল লাগে। যারীদের অনুপম চরিত্র আর অমায়িক ব্যক্তিত্ব তাকে জয় করে নেয়।

॥ সাতান্ন ॥

"যারীদকে মক্কায় অনেকবার আমি দেখেছিলাম।" ইউহাওয়া কা'ব বিন আসাদের বাসভবনে ঘটনা বর্ণনার এক পর্যায়ে বলে—"কিন্তু আমি কখনো তাকে গুরুত্ব দিইনি। স্বগোত্রে তার বিশেষ কোন মর্যাদা কিংবা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিল না। কিন্তু সেদিন গুহায় তার একান্ত সান্নিধ্য এবং অন্তরঙ্গভাবে তার সাথে বসে আমার অনুভব হতে থাকে যে, লোকটি বিশিষ্টজনদেরও অন্যতম।"...

"ঘূর্ণিঝড় যখন বন্ধ হয় সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে লুকিয়ে পড়ার উপক্রম। সে আমাকে চলে আসতে বললে আমি তার পিছু পিছু গুহা হতে বেরিয়ে আসি। সামান্য দূরে তার উট টিলার সাথে লেগে বসা ছিল। সে উটে চড়ে আমাকে তার পিছনে বসায়। তার ইশারায় উট উঠে দাঁড়ায় এবং চলতে শুরু করে। ততক্ষণ আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রাকৃতিক আলোয় স্থানটি দেখতে চেষ্টা করি। বড়ই ভয়ঙ্কর লাগে। এই ভীতিকর স্থান সম্পর্কে ইতিপূর্বে কতকথা শুনেছিলাম। ঘূর্ণিঝড় চলাকালে কিছুই ঠাওর করতে পারিনি। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় থেমে যাওয়ার পর চোখ ফিরালে সারা শরীর কেঁপে ওঠে। ভয়ে লোমকূপ দাঁড়িয়ে যায়। কতক টিলা ছিল দেখতে অবিকল মানুষের মত। টিলাগুলোর রঙও ছিল হৃদয় কাঁপানো।"...

"উষ্ট্রারোহীতে আমি যথেষ্ট পাকা ছিলাম। উট দৌড়ানোও আমার জন্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সেদিনের পড়ন্ত বিকেলে যারীদের পিছে উটে সওয়ার থাকা সত্ত্বেও আমার শুধু পড়ে যাওয়ার ভয় করে। যারীদের কোমরে হাত দিয়ে তাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরি। এক সময় এ অনুভূতি বোধ আমার মধ্যে জেগে ওঠে যে, আমি এক দুর্বল নারী মাত্র। আর যারীদ হলো আমার রক্ষক। ধর্মের স্বার্থে আমি কি করছি তা অনেকেই জানে। কিন্তু এ তথ্য কেউ জানে না যে, পিতাই আমাকে এ পথে পরিচালিত করেছে।"

প্রসঙ্গক্রমে ইউহাওয়া তাদেরকে এ তথ্য জানায় যে, কুরাইশরা বদরে মুসলমানদের হাতে পরাস্ত হয়ে এলে নিহতদের নিকটাত্মীয় মহিলারা হাত নাড়ায়ে নাড়ায়ে শোক প্রকাশ করে। ইউহাওয়ার পিতা ছিল কট্টর ইহুদী। কুরাইশদের পরাজয়ে তার চোখের পানি বেয়ে যায়। সে মন্তব্য করে বলেছিল, এক হাজার কুরাইশ যোদ্ধা যদি মাত্র তিনশ তেরজন মানুষের কাছে পরাজিত হয়, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, "মুহাম্মাদের কাছে সত্যই কোন জাদু আছে।" সে অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলে—"মুহাম্মাদের অনুসারী তারাও তো কুরাইশ গোত্রের। আসমান থেকে তারা আসেনি। তাহলে এই ক্ষুদ্র দলটি কিভাবে জিতে গেল?"

তখন ইউহাওয়ার বয়স অল্প। পরের দিন তার পিতা পরিবারের সকলকে ডেকে পূর্বরাতে দেখা স্বপ্নের বিবরণ পেশ করে। সে স্বপ্ন দেখেছিল, তার হাতে রক্তস্নাত একটি তলোয়ার। একটি লোক তার সামনে মাটিতে ছটফট করছে। তার বস্ত্র রক্তে লাল। ইউহাওয়ার পিতা চিনতে পারে না যে, যাকে সে হত্যা করল কে সে? স্বপ্নের মাঝে একটি আওয়াজ তার কানে ভেসে আসে—"এটা তোমারই সম্পন্ন করতে হবে।" নিহত ব্যক্তি কিছুক্ষণ ছটফট করে মরে যায়। লাশ নিজে নিজেই ভূতলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখান থেকে বড়ই সুন্দরী একটি বালিকার অভ্যুদয় হয়। ঠোঁট ভরা থাকে তার মুচকি হাসিতে।

তার পিতা স্বপ্নটি দেখে বড়ই প্রভাবিত হয়। ব্যাখ্যা জানার জন্য লাঈছ বিন মোশানের কাছে যায়। স্বপ্নের বৃত্তান্ত তাকে খুলে বললে লাঈছ তাকে এই পরামর্শ দেয় যে, তোমার অল্পবয়স্কা মেয়ে ইউহাওয়াকে ইসলামের শিকড় কাটার জন্য উৎসর্গ করে দাও। বুড়ো ইহুদী জাদুকর লাঈছ তার পিতাকে এ ভবিষ্যদ্বাণীও জানায় যে, মুহাম্মাদ নামে যিনি নবুওয়াতের দাবী করেছেন তিনি এ মেয়েটির হাতেই নিহত হবেন অথবা এই মেয়েটি তাঁর নবুওয়াতের পরিসমাপ্তির উপলক্ষ হবে। লাঈছ ইউহাওয়ার পিতাকে এ অনুরোধও জানায় যে, সে যেন ইউহাওয়াকে তার কাছে নিয়ে আসে।

ইউহাওয়াকে লাঈছ বিন মোশানের হাওলা করে দেয়া হয়।

॥ আটান্ন ॥

"আমি মেয়েটিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়েছি।" লাঈছ বিন মোশান ইউহাওয়ার কথার মাঝখানে বলে—"ইহুদীদের খোদা তাকে যে রূপ-সৌন্দর্য এবং যে পুতুল গঠন দান করেছে, তাতে তাকে আকর্ষণীয় তলোয়ার কিংবা বিষাক্ত মিষ্টান্ন বলা যেতে পারে। কুরাইশ-মুসলমান সংঘর্ষে জড়াতে সে যে ভূমিকা রেখেছে তা তোমাদের কারো পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্র-প্রধানদেরকে এই মেয়েটি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে একতাবদ্ধ এবং মুহাম্মাদের শত্রুতে পরিণত করেছে। মুহাম্মাদকে হত্যার যে পরিকল্পনা ও নিপুণ ব্যবস্থা সে আমাকে সামনে রেখে করেছে, তা তারই মুখ থেকে শোনা যাক।"

ইউহাওয়া বলতে শুরু করে, লাঈছ বিন মোশান তার মাঝে এমন সাহস এবং এমন মেধার সমন্বয় ঘটায় যে, সে রূপবলে পুরুষকে কুপোকাত করতে ধারণাতীত পারদর্শী হয়ে ওঠে। অপূর্ব সৌন্দর্যের পাশাপাশি তার মধ্যে পুরুষের মত সাহসও সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার উস্তাদ তাকে ঘুণাক্ষরেও একথা জানায় না যে,

যে নয়া ধর্ম-বিশ্বাস রুখতে এবং যে মহান ব্যক্তিত্বের হত্যা করা তার অভিলাষ, সে ধর্ম-বিশ্বাস খোদ আল্লাহ তাআলারই প্রদত্ত এবং তিনিই ঐ মহান ব্যক্তিত্বকে এই নয়া ধর্মমতের প্রচার-প্রসার এবং উন্নতির উদ্দেশে রসূল করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

ইউহাওয়াকে এমন চিন্তা-চেতনায় গড়ে তোলা হয় যে, সে নিজের ধর্মকেই শুধু পৃথিবীর একমাত্র সত্য ধর্মমত বলে মনে করত। হক পন্থীদের সাথে যে আল্লাহ্ পাক থাকেন-একথা তার দেমাগে ঢুকত না। সে নিজ ধর্ম ছাড়া কিছুই বুঝত না, স্বীকার করত না। লাঈছের প্রশিক্ষণ তাকে কট্টর ও ইহুদীবাদের গোঁড়া অন্ধভক্তে পরিণত করে। আল্লাহ্ তায়ালা ঘূর্ণিঝড়ের মাঝে তাকে একাকী নিক্ষেপ করে তাকে বাস্তব চেতনায় অনুপ্রাণিত করতে চান। কিন্তু সে আল্লাহ্র ইশারা ও অভিপ্রায় অনুধাবন করতে পারে না। বিপদে নিপতিত করে ভুল ভেঙ্গে দেয়াই ছিল আল্লাহ্ পাকের অভিলাষ। দৃঢ় হিম্মত এবং অসীম সাহসিকতার ব্যাপারে তার মাঝে যথেষ্ট গর্ব ছিল। সে নিজেকে এ ব্যাপারে পুরুষের মত বলে মনে করত। অথচ এখন সে এক অতি দুর্বল এবং চরম অসহায় এক নারী বৈ নয়।

ইউহাওয়া পুরুষের দেহ সম্পর্কে অপরিচিত কিংবা অনবহিত ছিল না। যারীদ বিন মুসাইয়িবের দেহ এক পুরুষের দেহ বৈ ছিল না। কিন্তু তার কাছে যারীদের দেহ অত্যন্ত পূত-পবিত্র এবং নিষ্কলুষ মনে হয়। যারীদ তার কাছে যেন সাক্ষাৎ ফেরেস্তা মূর্তি। তার এ অনুভবের কারণ, সে তার রূপ-লাবণ্য, রেশমী চুল এবং আকর্ষণীয় দৈহিক গঠনে বিন্দুমাত্র প্রলুব্ধ হয়নি। যারীদের এই নির্মল ও অমায়িক চরিত্রের প্রভাব ইউহাওয়ার উপর এমন গভীর রেখাপাত করে যে, সে তার দেহের প্রতি এক ধরনের টান ও আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে।

মক্কা বেশী দূরে ছিল না। সন্ধ্যার পর গভীর রাতে যারীদ ইউহাওয়াকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। কেল্লার মত গেট খুলতেই তার পিতাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখা যায়। তার আশা ছিল না যে, মেয়ে তার জীবিত ফিরে আসবে। তার পিতা যারীদকে ভেতরে ডেকে নিয়ে শরাব দ্বারা আপ্যায়ন করে। যারীদ চলে গেলে ইউহাওয়া তার সত্তার মাঝে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে।

পরের দিনই ইউহাওয়া এক বার্তাবাহকের মাধ্যমে যারীদকে সাক্ষাৎ করতে বলে। খবর পেয়েই যারীদ চলে আসে। এটা অনুরাগের সাক্ষাৎ ছিল। যারীদ এ সাক্ষাতকে অনুরাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। সামনে বাড়তে দেয় না। এরপরেও তাদের নিয়মিত সাক্ষাৎ হতে থাকে। ইউহাওয়া তো অনেক পূর্বেই যারীদকে ভালবেসে ফেলে। বারংবার দেখা-সাক্ষাতের পর যারীদের অন্তরেও ইউহাওয়ার

প্রতি ভালবাসা জন্ম নেয়। তবে এ ভালবাসা নির্মল ও নিষ্কলুষ ছিল। ইউহাওয়া বিস্মিত না হয়ে পারে না, যখন দেখে তার আত্মার মাঝে ভালবাসার অনুরাগ বিদ্যমান। সম্পর্ক গভীর হলে একদিন যারীদ ইউহাওয়াকে জিজ্ঞাসা করে, সে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে কেন আবদ্ধ হয় না?

"না।" ইউহাওয়া আঁৎকে উঠে বলে—"আমি তোমার শরীরের পূজারী। বিবাহ হয়ে গেলে এই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আর থাকবে না।"

"আমার মেয়ে অনেক; একটিও ছেলে নেই।" যারীদ উদাসভাবে তাকে জানায়—"আমি দ্বিতীয় বিবাহ করতে ইচ্ছুক। আমি পুত্র চাই।"

ইউহাওয়া গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। কি জবাব দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করবে ভেবে পায় না। যারীদের ব্যথা তাকে আহত করে। যেভাবেই হোক যারীদের এই অভিলাষ সে পূরণ করতে চায়। দীর্ঘ চিন্তার পর একটি উপায় তার মাথায় আসে।

"লাঈছ বিন মোশান নামে আমাদের এক শ্রদ্ধাস্পদ লোক আছেন।" ইউহাওয়া বলে—"তিনি বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন। তার হাতে এক অস্বাভাবিক শক্তি আছে। আমার বিশ্বাস, তিনি নিজ জ্ঞান ও ক্ষমতাবলে প্রথম স্ত্রীর গর্ভ থেকেই তোমাকে পুত্র-সন্তান দান করবেন। আমার সাথে এস। তিনি আমার দীক্ষাগুরু।"

যারীদ তার সাথে লাঈছ বিন মোশানের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

॥ ঊনষাট ॥

অল্পদিনের মধ্যে তাদের মাঝে দু'পুরুষ কিংবা দু'নারীর মত গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। একান্ত আলাপচারিতায় বসলে তাদের মধ্যে রাসূল (সা.) বিরোধী আলোচনাও হত। ইসলামের ক্রমোন্নতি রোধে তারা পরিকল্পনাও করত। কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংক্রান্ত পদক্ষেপে যারীদ আগ্রহ দেখাত না। এটা ইউহাওয়ার মনঃপূত হত না। ইউহাওয়া তাকে উত্তেজিত ও প্ররোচিত করতে থাকে।

"আমার ধর্ম তুমিই।" যারীদ বিন মুসাইয়্যিব একদিন সিদ্ধান্ত জানানোর ভঙ্গিতে ইউহাওয়াকে বলে—"তুমি আমার স্ত্রী হও বা না হও, তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারব না।"

"একটি গোপন কথা তোমাকে জানাই যারীদ!" ইউহাওয়া তার আকুলতা দেখে বলে—"আমার পক্ষে কারো স্ত্রী হওয়া অসম্ভব। পিতা আমার জীবনকে

ইহুদী স্বার্থে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। লাঈছ বিন মোশান আমার এই কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, আমি যে-কোন পন্থায় ইসলামের শত্রু বৃদ্ধি করে যাব। আমার অন্তরে আমার ধর্মমত ছাড়া একমাত্র তোমার ভালবাসা রয়েছে। আমাকে তোমার বলে মনে করবে।"

একদিন যারীদ ইউহাওয়ার সাথে লাঈছ বিন মোশানের সাক্ষাতে যায়। ইউহাওয়া প্রথমেই তাকে লাঈছের কাছে না নিয়ে বাইরে বসিয়ে রেখে নিজে ভিতরে প্রবেশ করে। যারীদের পরিচয় দিয়ে সে লাঈছকে স্পষ্টভাষায় জানায় যে, যারীদকে সে ভালবাসার দেবতা মনে করে। সে আরও জানায়, এই যারীদই তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করে। যারীদকে এখানে আনার উদ্দেশ্যও তাকে জানায় যে, যারীদের কন্যাসন্তান অনেক। পুত্র-সন্তান একটিও নেই।

"যারীদের স্ত্রীর গর্ভ হতে পুত্র-সন্তান প্রসবের ক্ষমতা আপনার আছে কি?" ইউহাওয়া ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চায়।

"কেন নয়?" লাঈছ বিন মোশান বলে—"প্রথমে তাকে দেখতে হবে। এরপর চিন্তা করে বলব, তার সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে। তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

ইউহাওয়া বাইরে এসে যারীদকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয় এবং নিজে বাইরে অপেক্ষা করে। দীর্ঘ সময় পরে লাঈছ তাকে বাইরে পাঠিয়ে ইউহাওয়াকে ভেতরে ডেকে নেয়।

"যে ব্যক্তি তোমার মত সুন্দরী-রূপসী এবং আকর্ষণীয় নারীর সাথে এতদিন উঠা-বসা করেও পবিত্র ভালবাসার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পারে, সে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক" লাঈছ স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে মন্তব্য করে—"অথবা সে এতই দুর্বলপনা যে, সে তোমার রূপের জাদুতে পুরোপুরি বন্দী হয়ে তোমার দাসে পরিণত হবে।"

"যারীদ অবশ্যই দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক।" ইউহাওয়া জোর দিয়ে বলে।

"যারীদের ভিতরগত সত্তাটি খুব দুর্বল।" লাঈছ বিন মোশান বলে—"তোমার ব্যাপারে তার সাথে আমার কোন কথা হয়নি। আমি তার সত্তার মাঝে ডুব দিয়ে জেনেছি। লোকটি তোমার মাঝে বন্দী।

"পবিত্র গুরুজী!" ইউহাওয়া উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞাসা করে—"তার সম্পর্কে এমন কথা আপনি কেন বলেছেন?... আমার শুধু ইচ্ছা, তাকে একটি পুত্রের ব্যবস্থা করে দেয়া। আমি তাকে এতই ভালবাসি যে, তার পুত্র-সন্তানের ব্যবস্থা অন্যভাবে না হলে আমিই তার পুত্রের গর্ভধারিণী হতে প্রস্তুত।

"না বেটি!" বুড়ো লাঈছ দৃঢ়তার সাথে বলে—"তোমার উদর হতে তার পুত্র জন্ম নিবে না। ইহুদীদের খোদা যে পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য আমার এবং তোমার কাঁধে অর্পণ করেছেন, তা পালনে এ ব্যক্তি অন্যতম সহায়ক হবে।"

ইউহাওয়া অবাক হয়ে নীরবে লাঈছ বিন মোশানের চেহারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে।

"তুমি যাকে ভালবাসার দেবতা মনে কর সেই তথাকথিত নবুওয়াতের দাবীদারকে হত্যা করবে।" লাঈছ ক্রুর হেসে বলে—"এ কাজে যারীদের উপযুক্ত আর কেউ হতে পারে না।"

"এটা কি আপনার নিছক ভবিষ্যদ্বাণী?" ইউহাওয়া জিজ্ঞাসা করে—"এ কিভাবে হত্যা করবে?"

"তাকে আমিই প্রস্তুত করব" লাঈছ বলে।

"এ প্রস্তুত হবে না।" ইউহাওয়া বলে—"সে অনেকবার বলেছে, তার কোন নির্দিষ্ট ধর্ম নেই। মুহাম্মাদকে সে শত্রু মনে করে না। হত্যা-লুণ্ঠন তার একেবারে অপছন্দ।

"অনায়াসেই সে সবকিছু করবে।" বুড়ো লাঈছ বলে—"তার দেমাগ আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তুমি আমাকে সহায়তা করবে। তিন দিন পর্যন্ত সে সূর্যের মুখ দেখবে না। এরপর যখন তাকে বাইরে আনা হবে তার মুখ থেকে শুধু এ কথাই বের হবে যে, নবীর দাবীদার কোথায়? আমি তাকে প্রাণে মেরে ফেলব।"

"পবিত্র পিতঃ!" ইউহাওয়া ধরা গলায় অনুনয় করে বলে—"এত কষ্ট যারীদ সহ্য করতে পারবে না। নিশ্চিত মারা যাবে। শুধু এ লোকটিই...।"

"ইহুদীদের খোদার চেয়ে অধিক ভালবাসার যোগ্য আর কেউ নয়।" লাঈছ ইউহাওয়ার আবেদন মাঝপথে কেটে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—"এতটুকু কুরবানী তোমাকে দিতেই হবে। যারীদ আর মক্কায় ফিরে যাবে না।"

॥ ষাট ॥

ইউহাওয়াও আর মক্কায় ফিরে যায় না। যারীদও যায় না। বুড়ো লাঈছ উভয়কে দীর্ঘ তিনদিন তিনরাত একটি কক্ষে আটকে রাখে। যারীদকে নিজের সামনে বসিয়ে তার চোখে চোখ রাখে। এরপর তাকে কিছু পান করিয়ে অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করে। সে ইউহাওয়াকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে যারীদের পাশে বসিয়ে দেয়। লাঈছ ইউহাওয়াকে যে নির্দেশ দেয়, সে বিনা বাক্যব্যয়ে তা করে যায়।

"যারীদের দেমাগ ও তার চিন্তা-চেতনা কিভাবে আমি নিয়ন্ত্রণ করলাম তা এখানে সকলের সামনে খুলে বলা আদৌ জরুরী মনে করি না।" লাঈছ কক্ষের লোকদের উদ্দেশে বলে—"আমি তাকে সাথে করেই নিয়ে এসেছি। তোমরা নিজ চোখে তাকে দেখতে পার।

লাঈছ ইউহাওয়াকে ইশারা করলে সে বাইরে চলে যায় এবং একটু পরেই যারীদকে সাথে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। যারীদ ভেতরে ঢুকে পালাক্রমে সবাইকে দেখতে থাকে।

"সে এখানে নেই।" যারীদ মুখ তুলে বলে—"আমি তাকে ভাল করেই চিনি। সে আমারই গোত্রের লোক। সে এখানে নেই।"

" ধৈর্য ধর যারীদ!" বুড়ো লাঈছ বলে—"আমরা অবশ্যই তার পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দিব। কাল...হ্যাঁ, আগামীকালই যারীদ!... এখন বস।"

যারীদ ইউহাওয়ার গা ঘেঁষে বসে পড়ে এবং তার হাত ধরে আরো কাছে টেনে আনে।

খন্দক যুদ্ধে বিজয়ের পরবর্তী দিন যখন মদীনার জনতা বিজয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন করতে থাকে এবং অপরদিকে কা'ব বিন আসাদের বাসভবনে ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের নীল নক্সা প্রণীত হয় ঠিক সে মুহূর্তে রাসূল (সা.)-কে জানানো হয় যে, বনূ কুরাইযার প্রধান কা'ব বিন আসাদ মদীনা অবরোধের কালে কুরাইশ ও গাতফানদের সাথে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। হযরত নুআইম বিন মাসউদ (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সে চুক্তি নিষ্ফল ও ব্যর্থ করে দেন।

এটিও ছিল গত চারদিন পূর্বের একটি ঘটনা। এ ঘটনায় রাসূল (সা.)-এর ফুফু হযরত সফিয়াহ (রা.) এক ইহুদী গোয়েন্দাকে হত্যা করেছিলেন। গোয়েন্দাটি মুসলমানদের স্ত্রী ও সন্তানদের আশ্রিত ছোট কেল্লায় বাইরে থেকে গোপনে প্রবেশ করা যায় কি-না তা পরখ করছিল। কিন্তু সে হযরত সফিয়াহ (রা.)-এর চোখে পড়ে যায়। তিনি ইহুদীকে চ্যালেঞ্জ করলে ইহুদী তাকে একজন দুর্বল নারী মনে করে বড় গর্বের সাথে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছিল, সে একজন ইহুদী এবং গোয়েন্দাগিরি করার জন্য এসেছে। হযরত সফিয়াহ (রা.) অলৌকিকভাবে ইহুদীর তলোয়ারের মোকাবেলা লাঠির সাহায্যে করেন এবং কৌশলে তাকে কুপোকাত করে বড় করুণভাবে হত্যা করেন।

"আল্লাহ্র কসম!" জনৈক সাহাবী জোরালো কণ্ঠে বলেন—"ইহুদীদের উপর আস্থা স্থাপন এবং তাদের চুক্তি ভঙ্গের অপরাধ ক্ষমা করা নিজ হাতে খঞ্জর নিজের হৃদপিণ্ডে আমূল বসিয়ে দেয়ার নামান্তর।"

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আসমা এবং হযরত নাফে (রা.) হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খন্দক যুদ্ধ শেষে নবী করীম (সা.) নির্দেশ জারী করেন—"তোমরা বনূ কুরাইযায় গিয়ে আসরের নামায পড়বে।"

হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনায় আরেক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, "জিব্রীল বাহিনীর অশ্বখুরে উত্থিত ধুলা-বালু আমার নজরে এখনও ভাসছে। এ দৃশ্য তখনকার, যখন রাসূল (সা.) বনূ কুরাইযার চুক্তি লঙ্ঘন এবং ঘৃণ্য প্রতারণার শাস্তি দিতে গিয়েছিলেন।

সকল ঐতিহাসিক একযোগে বর্ণনা করেন, রসূল (সা.)-এর নির্দেশে মুসলমানগণ তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র অবস্থায় রওনা হন এবং বনূ কুরাইযার সমস্ত দুর্গ অবরোধ করেন। অসংখ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত সা'দ বিন মুয়াজ (রা.)-কে বনূ কুরাইযার নেতাদের প্রতি এই পয়গাম দিয়ে প্রেরণ করা হয় যে, চুক্তি লঙ্ঘনের শাস্তি যেন তারা নিজেরাই ঠিক করে নেয়। হযরত সা'দ (রা.) আহত ছিলেন। খন্দক যুদ্ধ চলাকালে হাব্বান বিন আরাফা নামক এক কুরাইশীর বর্শাঘাতের শিকার হন তিনি।

॥ একষট্টি ॥

লাঈছ বিন মোশান, ইউহাওয়া এবং নেতা পর্যায়ের আরো তিন চার ইহুদী তখনও কা'ব বিন আসাদের নিকট বসা ছিল। যারীদ বিন মুসাইয়্যিবও তথায় ছিল। তারা চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্য রাতের আঁধারকে সর্বসম্মতভাবে বেছে নেয়। প্রস্তাব উত্থাপন ও তা পাশ হওয়ার ঠিক মুহূর্তে এক ইহুদী দৌড়ে কক্ষে প্রবেশ করে।

"মুসলমানরা এসে গেছে।" ইহুদী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে—"এটা স্পষ্ট যে, তারা বন্ধু হয়ে আসছে না। ধুলা বলছে, তারা স্রোতের মত আসছে। ধুলা ডানে-বামে ছড়ানো।... দেখ। শীঘ্র চল এবং দেখ।"

কা'ব বিন আসাদ দৌড়ে বাইরে এসে দুর্গ-শিখরে ওঠে। সেখান থেকে এক প্রকার দৌড়ে নিচে নামে এবং সোজা লাঈছ বিন মোশানের কাছে চলে যায়।

"পবিত্র মোশান!" কা'ব বিন আসাদ কম্পিত কণ্ঠে বলে—"আপনার জাদু ঐ বর্শা ও তলোয়ারগুলো টুকরো টুকরো করতে পারে, যা আমাদের হত্যা করতে উদ্যত?"

"হ্যাঁ, পারে।" বুড়ো লাঈছ কা'বকে আশ্বস্ত করতে বলে—"মুহাম্মাদের জাদু বেশী বেড়ে গেলে আমার জাদু-নৈপুণ্য দেখাতে বাধ্য হব।...তুমি উপরে উঠে কি দেখে এলে?"

"খোদার কসম!" কা'ব বিন আসাদ বলে—"এই চানক্য গোয়েন্দাগিরি নুআইম বিন মাসউদই করেছে। আমার জানা ছিল না যে, সে মুসলমান হয়ে গেছে।... মুসলমানরা এখন অবরোধের পর্যায়ে আছে। আমাদের বের হবার সকল পথ রুদ্ধ।"

"এ দু'জনকে যে কোন উপায়ে বের করার ব্যবস্থা কর।" লাঈছ বলে—ইউহাওয়া! যারীদকে নিয়ে খিড়কি পথে বেরিয়ে যাও। আমি তোমাদের পিছে আসছি।"

"আপনি উপরে যাচ্ছেন না কেন, লাঈছ বিন মোশান!" কা'ব উৎকণ্ঠার সাথে বলে—"আপনার সেই জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং সেই জাদু-নৈপুণ্য কোথায় গেল, যা আপনি...।"

"এ রহস্য বোঝা তোমার সাধ্যের বাইরে" বুড়ো লাঈছ বলে—"হযরত মুসা (আ.) একদিনেই ফেরআউনকে শেষ করে দেন না। আমার হাতে যে লাঠি দেখছ তা ঐ লাঠি, যা দ্বারা হযরত মূসা (আ.) পানিতে আঘাত করলে পানি সরে গিয়ে তাঁর সাথীদের জন্য পথ তৈরী করে দিয়েছিল। এটা লাঠিরই মোজেযা ছিল যে, ফেরআউনের সৈন্য-সামন্ত এবং সে নিজে মধ্য দরিয়ায় ডুবে ধ্বংস হয়ে যায়। যেভাবে হযরত মূসা (আ.) তাঁর গোত্রকে মিসর থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন, অনুরূপ আমি তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব।"

ইউহাওয়া এবং যারীদ ইতিমধ্যে খিড়কি পথে বেরিয়ে যায়। লাঈছ বিন মোশানও হাঁটা দেয়।

॥ বাষট্টি ॥

মুসলিম সৈন্যরা বনূ কুরাইযার লোকালয়ের নিকটে এসে পড়লে মহিলা এবং বাচ্চারা তুলকালাম অবস্থা সৃষ্টি করে। সবার মাঝে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মহিলা এবং শিশুরা নিজ নিজ ঘরে পালিয়ে যেতে থাকে। একজনও মোকাবেলার জন্য কেল্লা হতে বের হয় না। যে সৈন্যরা পর্বতশৃঙ্গের দিক থেকে অবরোধের উদ্দেশে আসতে থাকে দু'জন পুরুষ আর একজন নারী তাদের চোখে পড়ে। তিনজনই পালিয়ে যাচ্ছিল। বৃদ্ধ পুরুষ এবং মহিলাটি তাদের সাথীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। লোকটি বারবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছে তাকাচ্ছিল এবং সামনে যেতে চাচ্ছিল না।

এ তিনজন ছিল লাঈছ, যারীদ এবং ইউহাওয়া। লাঈছ যারীদের দেমাগের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তাকে রাসূল (সা.)-এর হত্যায় উদ্বুদ্ধ করে

তোলে। কিন্তু যারীদ এখন তার জন্যই কাল হয়ে দাঁড়ায়। হেপনাটিজম বা দুর্বার আসক্তিতে এ সময় তার দেমাগ তীব্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে তাদের হাত থেকে ছুটে যেতে চায় বারবার। ইউহাওয়া ভালবাসার টানে তাকে সাথে নিয়ে চলে। তার প্রবল আশঙ্কা ছিল, যারীদকে ছেড়ে দিলে সে নির্ঘাত মুসলমানদের হাতে প্রাণ খোয়াবে। লাঈছের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। সে তাকে জোর করে হলেও এই উদ্দেশ্য নিয়ে যেতে চেষ্টা করে যে পরবর্তীতে সুযোগমত আবার তাকে রাসূল (সা.)-এর হত্যার কাজে ব্যবহার করবে। তারা যতই তাকে নিয়ে যেতে চায়, সে ততই বলতে থাকে—"যে নিজেকে নবী বলে দাবী করে সে কোথায়?...সে আমাদেরই লোক।...আমার হাতেই তার মৃত্যু।...আমাকে ছেড়ে দাও।...আমি মদীনায় যেতে চাই।"

এক মুসলমান পর্বতশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে তাদের থামতে বলে। লাঈছ এবং ইউহাওয়া আওয়াজের উৎস লক্ষ্য করে পিছনে তাকায় এবং যারীদকে সেখানে ফেলে রেখে নিজেরা পালিয়ে যায়। যারীদ অসি কোষমুক্ত করে।

"মুহাম্মাদ কোথায়?" যারীদ তলোয়ার নাচিয়ে পর্বতশৃঙ্গ পানে আসতে আসতে বলে—"সে আমাদেরই বংশের সন্তান। আমি তাকে ভালভাবেই চিনি। আমি তাকে হত্যা করব। সে নবুওয়াতের দাবী করেছে।...ইউহাওয়া শুধু আমার।"

"ইউহাওয়া হুবল ও উযযা দেব-দেবী হতেও পবিত্র।" যারীদ সামনে চলে এবং গর্জে উঠে বলতে থাকে—"নবী কই? তাকে সামনে হাজির কর।"

আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর এত অপমান কোন্ মুসলমান সইতে পারে? যে মুসলমান তাদেরকে থামার আহ্বান করেছিলেন, তিনি ধনুকে তীর সংযোজন করেন এবং চোখের পলকে তীর যারীদের ডান চোখ দিয়ে ঢুকে মাথার খুপড়ির বেশ গভীরে চলে যায়। যারীদের এক হাতে তলোয়ার ছিল। তার অপর হাত মুহূর্তে ডান চোখে চলে গেলে হাত তীরের উপর গিয়ে পড়ে। সে থমকে দাঁড়ায়। শরীর ঢুলতে থাকে। হাঁটু এক সময় মাটিতে গিয়ে লাগে। তলোয়ার ধরা হাত মাটিতে এমনভাবে গিয়ে পড়ে যে, তলোয়ারের আগা ঊর্ধ্বমুখী ছিল। যারীদ ধপাস করে সামনের দিকে পড়ে যায়। তলোয়ারের আগা তার শাহরগে আমূল ঢুকে যায়। হাল্কা দাপাদাপি করে চিরদিনের জন্য নিথর ও নীরব হয়ে যায় সে।

॥ তেষট্টি ॥

আহত হযরত সা'দ বিন মুআজ (রা.) কা'ব বিন আসাদের দরজায় গিয়ে নক করেন। কা'ব কোন খাদেম না পাঠিয়ে নিজেই গিয়ে দরজা খোলে।

“বনূ কুরাইযার সর্দার!” হযরত সা’দ কোন ভূমিকা ছাড়াই বলেন—“তোমার গোত্রের ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত জানে এবং দেখেছে যে, তোমাদের বসতি আমরা ঘিরে ফেলেছি। তুমি অস্বীকার করতে পার যে, তুমি ঐ অপরাধ করনি, যার শাস্তি তোমার গোত্রের সকলে ভোগ করবে? চিন্তা করে দেখেছ, চুক্তি লঙ্ঘনের পরিণতি কত মারাত্মক?

“অস্বীকার করি না।” কা’ব পরাজয়ের সুরে বলে—“কিন্তু আবু সুফিয়ান আমার দ্বারা যে অপরাধ করাতে চেয়েছিল তা আমি করিনি।”

এই জন্য করনি যে, তুমি তার কাছে জামানত হিসেবে নেতৃপর্যায়ের লোক দাবী করেছিলে।” হযরত সা’দ (রা.) বলেন—“এর পূর্বে তুমি তাকে আশ্বস্ত করেছিলে যে, মদীনায় যেখানে মহিলা ও বাচ্চারা ছিল সেখানে তোমার গোত্র রাতের আঁধারে গেরিলা আক্রমণ করবে। একজন গোয়েন্দাও তুমি প্রেরণ করেছিলে পাপিষ্ঠ নরাধম! তুই ভুলে গিয়েছিলি যে, এক মুসলিম নারীও যদি হুশিয়ার থাকে তবে সে ইহুদীবাদের জঘন্য কারসাজি মাত্র একটি লাঠির দ্বারা ব্যর্থ করে দিতে পারে।”

“জানি, নুআইম বিন মাসউদ তোমাদের এ তথ্য প্রদান করেছে যে, আমি তোমাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি।” কা’ব বিন আসাদ পরাজয়ের ভঙ্গিতে বলে—“যা শুনেছ সবই সত্য। তবে আমি যা কিছু করেছি কেবল আমার গোত্রের নিরাপত্তার খাতিরেই করেছি।”

“ভাল কথা, এখন গোত্রের শাস্তি নিজেই নির্ধারণ কর।” হযরত সা’দ (রা.) বলেন—“তোমার জানা আছে, চুক্তিভঙ্গকারী গোত্রকে কেমন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এবং কি পরিণাম ভোগ করতে হয়। তুমি নিজে কোন শাস্তি নির্ধারণ না করলেও তোমার জানা আছে যে, তোমার গোত্রের পরিণাম কি হবে? বনূ কায়নুকা এবং বনূ নযীরের করুণ পরিণতির কথা ভুলে গেছ? খন্দক যুদ্ধে প্রাপ্ত এ আঘাতের কসম! তোমার গোত্রের পরিণতি হবে আরো ভয়াবহ।”

“হ্যাঁ, সা’দ!” কা’ব বিন আসাদ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—“আমি জানি, আমার গোত্রের পরিণতি কি হবে। আমাদের শিশু এবং মহিলারাও শেষ হয়ে যাবে। আমার সিদ্ধান্ত, চুক্তি অনুযায়ী আমার গোত্রের সকল পুরুষকে কতল করে দাও। মহিলা এবং বাচ্চাদেরকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাও। আমরা মারা গেলেও তারা তো জীবিত থাকবে।”

“শুধু জীবিত থাকবে না।” হযরত সা’দ (রা.) বলেন—“তারা আল্লাহ্র সত্য নবীর অনুসারী হয়ে সম্মানের সাথে জীবন যাপন করবে।... পুরুষদের বাইরে বের করে দাও।”

॥ চৌষট্টি ॥

হযরত সা'দ বিন মুআজ (রা.) ফিরে আসেন।

"হে আল্লাহ্র রাসূল!" তিনি ফিরে এসে রাসূল (সা.)-কে বলেন—"বনূ কুরাইযা নিজেরাই শাস্তি বেছে নিয়েছে। যুদ্ধ-সক্ষম পুরুষদের হত্যা করা হবে। আর নারী ও শিশুদেরকে আমাদের দায়িত্বে নিয়ে নিতে হবে।"

বনূ কুরাইযার পুরুষদেরকে সকলে কেল্লা ছেড়ে বাইরে আসতে দেখে। নিশ্ছিদ্র অবরোধের কারণে কারো পালিয়ে যাবার সুযোগ ছিল না। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, ইহুদীবাদের ইতিহাস ব্যাপক নৈরাজ্য, অনর্থ আর চুক্তি লঙ্ঘনের ইতিহাস। তাদের মানবেতিহাস এ সমস্ত অক্ষয় কলঙ্কে ভরপুর। এজন্য বিশ্বমাঝে তারা 'আল্লাহ্র তিরস্কৃত' জাতি হিসেবে পরিচিত। তাদের প্রতি যেই দয়ার্দ্র আচরণ কিংবা সমীহ প্রদর্শন করেছে, তারা তাকে চির লাঞ্ছিত করে ছেড়েছে। বনূ কুরাইযাকে ক্ষমা করা হলে তা হত সাংঘাতিক নির্বুদ্ধিতার কাজ। মুসলমানরা জেনে-শুনে এ পথে পা বাড়ায় না। তারা যুদ্ধ-সক্ষম সকল পুরুষকে কতল করে দেয়। আর বৃদ্ধ, নারী ও বাচ্চাদেরকে নিজেদের অভিভাবকত্বে নিয়ে নেয়।

দু'জন ঐতিহাসিক লেখেন, রাসূল (সা.) বনূ কুরাইযায় সৈন্য প্রেরণ করলে ইহুদীরা প্রবলভাবে সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মুসলমানরা দীর্ঘ পঁচিশ দিন পর্যন্ত তাদের অবরোধ করে রাখে। পরিশেষে ইহুদীরা রাসূল (সা.) বরাবর এই আবেদন করে যে, তিনি যেন হযরত সা'দ বিন মুআজ (রা.)-কে তাদের সাথে সন্ধির শর্ত চূড়ান্ত করতে পাঠান। হযরত সা'দ বিন মুআজ (রা.) তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে যান এবং এই সিদ্ধান্ত দিয়ে আসেন যে, বনূ কুরাইযার পুরুষদের হত্যা করা হবে এবং নারী ও শিশুরা গনীমত হিসেবে বিবেচ্য হবে। সমঝোতা অনুযায়ী চারশ ইহুদীকে হত্যা করা হয়।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, মুসলমানদের সাথে বনূ কুরাইযার সংঘর্ষ হয় না। অবরোধের এক পর্যায়ে তারা স্বীয় অপরাধের শাস্তি মাথা পেতে নিতে কেল্লা ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

মদীনায় ইহুদীদের গণহত্যার ঘটনা এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে এমন ঘটনা আরো দু'বার সংঘটিত হয়। বনূ কায়নুকা এবং বনূ নযীর নামক ইহুদীদের অপর দু'টি গোত্র কৃতচুক্তি ভঙ্গ করায় ইতিপূর্বে মুসলমানরা তাদেরকে এমনই শাস্তি দিয়েছিল। তখন তাদের নারী এবং শিশু-কিশোররা সিরিয়ায় পালিয়ে গিয়ে নতুন

বসতি স্থাপন করেছিল। তৎকালে সিরিয়া ইরানীদের দখলে ছিল। পরে এক খৃস্টান নরপতি হিরাক্লিয়াস আক্রমণ করে সিরিয়া দখল করে নেয়। ইহুদীরা তার সাথেও গাদ্দারী করে। এতে বাদশা হিরাক্লিয়াস দারুণ ক্ষেপে যায়। ঠিক যে মুহূর্তে মদীনায় মুসলমানরা বনূ কুরাইযাকে হত্যা করে চলে, ওদিকে হিরাক্লিয়াস তখন বনূ নযীর ও বনূ কায়নুকার উপর প্রতিশোধ নিতে গণহত্যায় লিপ্ত।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত হিশাম বিন উরওয়া (রা.) একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-এর সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন এবং বনূ কুরাইযার ইহুদীদেরকে হত্যা করা হয়। হযরত হিশাম (রা.) এটাও উল্লেখ করেছেন যে, তার সম্মানিত পিতা তাকে এ কাহিনী শুনিয়েছেন যে, খন্দক যুদ্ধে হযরত সা'দ বিন মুআজ (রা.)-এর বক্ষের উপরিভাগে বর্শা বিদ্ধ হয়। বনূ কুরাইযার শাস্তি সম্পন্ন হলে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে মসজিদে নববীর নিকটে হযরত মুআজ (রা.)-এর জন্য একটি তাঁবু স্থাপন করা হয়। চিকিৎসা ও সেবা ব্যবস্থার সুবিধার্থে তাঁকে এখানে রাখা হয়।

হযরত সাদ বিন মুআজ (রা.) তাঁবুতে শুয়ে পড়েন। কিন্তু কেন যেন ঘুম আসে না। তিনি উঠে বসেন। আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! বড় সাধ ছিল, রাসূল (সা.)-কে যারা সত্য নবী বলে মানে না তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবন উৎসর্গ করা। আপাত দৃষ্টিতে লড়াই শেষ হওয়ায় আমার সাধ আর পূরণ হল না। তিনি আল্লাহ্র দরবারে বড় অনুনয়-বিনয় করে দোয়া করেন, অল্পদিনের মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সে পর্যন্ত আমার হায়াত বাড়িয়ে দাও। আর যদি যুদ্ধের ধারাবাহিকতা আপাতত বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমার ক্ষত চাঙ্গা করে দাও, যাতে আমার জীবন তোমার রাহে উৎসর্গ হয়।

হযরত সা'দ (রা.)-এর দুয়া অন্তত চারজন শুনেন। কিন্তু তারা এটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। সকালে দেখা যায় হযরত সা'দ (রা.)-এর তাঁবু হতে রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে। তাঁবুতে ঢুকে জানা যায় তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। হযরত সা'দ (রা.) আল্লাহ্র দরবারে শাহাদাত কামনা করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করে নেন। তাঁর প্রায় শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতের ব্যান্ডেজ খুলে যায়। আর তা হতে অধিক রক্তক্ষরণের ফলে রক্তশূন্য হয়ে তিনি চির কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত লাভে ধন্য হন।

॥ পঁয়ষট্টি ॥

বনূ কুরাইযার বিপর্যয়ের খবর মক্কায় পৌঁছলে সবচে খুশী হয় আবু সুফিয়ান।

"খোদার কসম! বনূ কুরাইযার নেতা কা'ব বিন আসাদ আমাদের সাথে যে গাদ্দারী করেছিল তার উপযুক্ত সাজা পেয়েছে।" আবু সুফিয়ান আনন্দে বলে—"যদি তারা গাদ্দারী না করে রাতের আঁধারে মদীনায় গেরিলা আক্রমণ অব্যাহত রাখত, তাহলে বিজয় নিশ্চিত আমাদেরই হত। সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ মৃত্যু নয়, গনীমতের মাল দিতাম।... কি বল খালিদ! বনূ কুরাইযার পরিণতি কি বড়ই দুর্ভাগ্যজনক ও নির্মম হয়নি?"

হযরত খালিদ (রা.) আবু সুফিয়ানের প্রতি এমন দৃষ্টিতে তাকায় যেন আবু সুফিয়ানের কথা তার মনঃপূত হয়নি।

"বনূ কুরাইযার এই নির্মম পরিণতিতে তুমি খুশি নও খালিদ?" আবু সুফিয়ান তাঁর চাহনি দেখে জিজ্ঞাসা করে।

"মদীনা হতে পশ্চাদপসারণের বেদনা এত গভীর যে, যত বড়ই সুসংবাদ হোক না কেন আমার বেদনা লাঘব করতে পারবে না।" হযরত খালিদ বলেন—"গাদ্দারের বন্ধুত্ব শত্রুতার চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়। বলতে পার, ইহুদীরা এ পর্যন্ত কার সাথে ওয়াদা ঠিক রেখেছে? ইহুদীবাদের স্বার্থ রক্ষা এবং ক্রমোন্নতির জন্য যারা নিজ কন্যাকে অন্য জাতির পুরুষদের শয্যা বানাতে কুণ্ঠাবোধ করে না তাদের মত নীচ ও বিকৃত জাতির উপর কখনো আস্থা রাখা যায় না।"

"মুসলমান নয়, প্রবল ঝড় এবং ঘূর্ণিবায়ুই অবরোধ উঠিয়ে নিতে আমাদের বাধ্য করেছিল।" আবু সুফিয়ান বলে—"খাদ্য-সংকটও ছিল আমাদের।"

"যুদ্ধের মানসিকতাই তোমার ছিল না।" হযরত খালিদ গোস্বাভরে একথা বলেন এবং উঠে চলে যান।

এরপর থেকে হযরত খালিদ অধিকাংশ সময় নিশ্চুপ থাকতেন। কেউ কথা বলতে চাপাচাপি করলে রেগে যেতেন। তাঁর এই নীরবতাকে ঝড়ের পূর্বাভাস মনে করে আবু সুফিয়ান ভিতরে ভিতরে শিউরে ওঠে। হযরত খালিদ তাঁকে ভীতু-কাপুরুষ বলতেন। তিনি মনে মনে অঙ্গীকার করেছিলেন, যে কোন উপায়ে মুসলমানদের পরাজিত করবেনই। কিন্তু রণাঙ্গনে যখন মুসলিম বাহিনীর অপূর্ব রণকৌশল এবং বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা মনে পড়ত তখন মনে মনে রাসূল (সা.)-কে হাজারো ধন্যবাদ দিতেন। এমন যুদ্ধ-স্পৃহা এবং এমন সমর-কুশলতা

ও প্রজ্ঞা কুরাইশদের মধ্যে দুর্লভ ছিল। এ জাতীয় প্রজ্ঞা ও মেধা হযরত খালিদের মধ্যে ছিল। কিন্তু নিজ গোত্র হতে তিনি কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা পান না।

আজ মদীনা পানে একাকী গমনকালে হযরত খালিদের খন্দক রণাঙ্গন হতে সেই পশ্চাদপসারণের কথা মনে পড়তে থাকে। সাথে রাগও হচ্ছিল আবার লজ্জাও পাচ্ছিল। তখন থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ একটি বছর কেমন কাটালেন তাও স্মরণ হতে থাকে। মদীনায় আরেকটি আক্রমণ করার বড় আশা ছিল তাঁর। কিন্তু কুরাইশরা মোটেও রাজি হয় না। তারা মদীনার নাম শুনলেই ভীষণ ঘাবড়ে যেত।

একদিন তিনি জানতে পারেন যে, মুসলমানরা মক্কা আক্রমণ করতে আসছে। আবু সুফিয়ানই তাকে এ সংবাদ জানায়।

"মক্কা আক্রমণ করার দুঃসাহস মুসলমানদের শুধু এ কারণে হয় যে, আমরা বারবার প্রমাণ পেশ করেছি যে, কুরাইশরা মুহাম্মাদকে সত্যিকার অর্থেই ভয় পায়।" হযরত খালিদ আবু সুফিয়ানকে বলেন—"তুমি জনগণকে কখনো জানিয়েছ যে, মুসলমানরা মক্কার উপর চড়াও হতে পারে? তারা এই হামলা প্রতিহত করতে প্রস্তুত?"

"এখন এটা বিশ্লেষণের সময় নেই যে, আমরা অতীতে কি করেছি আর কি করিনি।" আবু সুফিয়ান বলে—"আমার সংবাদ সূত্র জানিয়েছে যে, মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার।...তুমি এ বিষয়ে একটু ভাববে কি?"

"আমার ভাবা হয়ে গেছে।" হযরত খালিদ বলেন—"আমাকে তিনশ অশ্বারোহী দাও। আমি পথিমধ্যেই মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করব। 'কারাউল গামীম' পাহাড়ের খাদে খাদে আমরা ওঁৎ পেতে থাকব। তারা এ উপত্যকা হয়েই আসবে। আমি তাদেরকে এই পাহাড়ি ভূমিতে ধুঁকে ধুঁকে মারব।"

"অশ্বারোহী যত লাগে নিয়ে যাও।" আবু সুফিয়ান তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে বলে—"এবং এক্ষুণি রওনা হয়ে যাও। এমন যেন না হয়, তোমরা সেখানে পৌঁছার পূর্বেই তারা সে স্থান পেরিয়ে চলে আসে।

হযরত খালিদের স্পষ্ট মনে পড়ে, মুসলমান কর্তৃক মক্কা আক্রমণ করতে রওনা হবার খবর তার দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল। তিনি ঐ দিনেই তিনশ অশ্বারোহীর এক শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে ফেলেন। মুসলমানদের সংখ্যা এক হাজার চারশ ছিল। অধিকাংশই পদাতিক। তিনশ অশ্বারোহীর নেতৃত্ব নিজের হাতে থাকায় হযরত খালিদ (রা.) খুব উৎফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। এবার

তিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ; কারো অনুগত কিংবা অধীনস্থ নন। আবু সুফিয়ানও তাঁর মাথার উপর সওয়ার নয়। যে কোন মুহূর্তে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে। মুসলমানদের চূড়ান্ত পরাজিত করার উদ্দেশে রওনা হন তিনি।

॥ ছেষট্টি ॥

দীর্ঘ এক বছর পর হযরত খালিদ (রা.) এখন মদীনার পথে। পরিমিত নিজের বিশ্রাম এবং ঘোড়াকে যথাসময়ে পানি পান করিয়ে চলছিলেন। ঘোড়াকে ক্লান্ত হতে দেন না। মক্কা থেকেই ঘোড়া আরামের সাথে পথ পাড়ি দিয়ে আসে। হযরত খালিদ অত্যন্ত দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। তার দেমাগে আকাঙ্ক্ষা কম কিন্তু ইচ্ছা বেশী উদয় হত। দেমাগের উপর সর্বদা তাঁর কড়া নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু মদীনার পথে এসে দেমাগ তাঁর উপর সওয়ার হয়ে যায়। স্মৃতির থাবা সামুদ্রিক তুফানের মাঝে চলন্ত জাহাজের মত তাঁর অভ্যন্তরে উত্থান-পতন ঘটাতে থাকে। মানসিক ভারসাম্যহীনের মত তার অবস্থা কখনো এমন হত যে, তিনি খুব জলদি মদীনায় যেতে চাইছেন। আবার কখনো চলার গতি বলে দিত যে, তাঁর জলদি যাওয়ার মোটেও তাড়া নেই। তাঁর চোখে দূরের বাড়ি-ঘরগুলো মরীচিকা মনে হয়। চলার সময় এগুলো ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকে।

ঘোড়া তার পিঠে আরোহীর মনোজগতের উত্থান-পতন এবং অস্থিতিশীলতা সম্পর্কে বে-খবর চলছিল।

আরোহী মাথা ঝাঁকি দিয়ে আশেপাশে নজর বুলায়। তার ঘোড়া একটু উঁচু স্থান অতিক্রম করছিল। দিগন্ত থেকে উহুদের পাহাড়সারি ইতিমধ্যে আরো উপরে উঠে আসে। হযরত খালিদের জানা ছিল একটু পরেই এই পাহাড়সমূহের গা ঘেঁষে মদীনার শহর ভেসে উঠতে থাকবে।

এ সময় স্মৃতি আরেকবার তাকে পিছনে নিয়ে যায়। মদীনার পরিখা এবং তা হতে দুর্ভাগ্যজনক পশ্চাদপসারণের কথা মনে পড়ে। পাশাপাশি মুসলমানদের হাতে চারশ ইহুদীর হত্যার দৃশ্যও তাঁর চোখের পাতায় ভেসে ওঠে। বনূ কুরাইযার এই মর্মান্তিক সংবাদে কুরাইশপতি আবু সুফিয়ান বেজায় খুশি হলেও হযরত খালিদ খুশীও হননি আবার দুঃখও প্রকাশ করেননি।

"ইহুদীদের প্রতারণার উপর ভর করে কুরাইশরা মুহাম্মাদের অনুসারীদের পরাজিত করতে চায়।" হযরত খালিদের মাথায় এই একটি কথা বারবার ঘুরে ফিরে উদয় হতে থাকে। তিনি চিন্তা থেকে এই কথাটি ঝেড়ে-মুছে ফেলতে সারা মাথায় হাত বুলান।

স্মৃতির চাকা তাকে অতীত থেকে দূর অতীতে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘন্টির টুনটুন ধ্বনি তাকে অতীত থেকে বের করে নিয়ে আসে। তিনি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ডানে-বামে তাকান। ধ্বনির উৎস খুঁজতে থাকেন। বামে বিস্তীর্ণ নিম্নভূমি ছিল। তিনি চলছিলেন উপর প্রান্ত দিয়ে। বামের নিম্নপ্রান্তে গিয়ে তার চোখ আটকে যায়। চারটি উট নিম্নপ্রান্ত দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখেন। উটগুলোর মধ্যে যথেষ্ট বুঝাপড়া ছিল। তারা চলছিল একের পর এক, লাইন দিয়ে। উটগুলোর পাশ ঘেঁষে একটি ঘোড়াও চলছিল। উটে দু'জন নারী, কতক বাচ্চা এবং দু'জন পুরুষ ছিল। কোন উটে গৃহস্থালী আসবাবপত্রও ছিল। ঘোড়ার আরোহী ছিল এক বয়োবৃদ্ধ লোক। তাদের চলায় যথেষ্ট গতি ছিল। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়ার গতি একটু কমিয়ে আনেন।

উট-ঘোড়া সমৃদ্ধ ছোট কাফেলাটি হযরত খালিদের নিকটে এসে পড়ে। বৃদ্ধ অশ্বারোহী তাকে চিনে ফেলে।

"তোমার সফর আরামদায়ক হোক ওলীদের পুত্র!" বৃদ্ধ হস্তদ্বয় প্রসারিত করে দোলায় এবং বলে—"নিচে এস, কিছুদূর এক সাথে যাই।"

হযরত খালিদ লাগাম ধরে টান দেন এবং আলতোভাবে ঘোড়ায় পদাঘাত করেন। প্রশিক্ষিত ঘোড়া প্রভুর ইশারা পেয়ে নিচে নেমে আসে চোখের পলকে।

"ঠিকই বলেছ।" হযরত খালিদ নিজের ঘোড়াটি বৃদ্ধের ঘোড়ার পাশে নিয়ে গিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন—"আবু যুরাইয!...আমার ধারণা, এরা তোমার পরিবার-পরিজন।"

"হ্যাঁ।" বৃদ্ধ আবু যুরাইয বলে—"ঠিকই ধরেছ, এরা আমার পরিবারের লোক।...তা খালিদ তুমি কোথায় চলেছ? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয় মদীনায় নয়।...সেখানে তোমার কি প্রয়োজন?"

কাফেলাটি ছিল গাতফান গোত্রের একটি পরিবার। তারা বসতি পরিবর্তন করছিল। আবু যুরাইয নিজেই যখন বলে যে, খালিদ মদীনায় যাচ্ছে না তখন তিনি তাকে গন্তব্য না জানানোই ভাল মনে করেন।

"কুরাইশদের বর্তমান চিন্তা-ভাবনা কি?" আবু যুরাইয জানতে চায়—"এ সংবাদ কি সত্য নয় যে, মানুষ দলে দলে মুহাম্মাদকে নবী বলে মেনে নিচ্ছে? এ ধারা অব্যাহত থাকলে সেদিন কি অতি নিকটে নয় যে, মদীনাবাসী একদিন মক্কার উপর চড়াও হবে আর আবু সুফিয়ান তাদের সামনে হাতিয়ার সমর্পণ করবে?"

"যে নেতা নিজের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়া জরুরী মনে করে না, অস্ত্র সমর্পণ করাটা তার কাছে কিছুই নয়।" হযরত খালিদ বলেন—"তোমার মনে নেই, আমরা সবাই মিলে মদীনা আক্রমণ করতে গেলে মদীনার জনগণ আক্রমণ এড়াতে চারদিকে পরিখা খনন করেছিল?" একটু থেমে হযরত খালিদ আবার বলেন—"আমরা পরিখা অতিক্রম করতে পারতাম। আমি তো অতিক্রমও করেছিলাম। ইকরামাও ওপারে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা-যাদের মাঝে তোমার গোত্রের যোদ্ধারাও ছিল-আমাদের সহযোগিতা করে না; দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে। দুঃখের কথা আর কি বলব, মদীনা হতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি পশ্চাদপসারণ করে সে ছিল আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু সুফিয়ান।"

"আমার বাহুতে এখন আর শক্তি নেই ইবনে ওলীদ!" আবু যুরাইয দুর্বলতা হেতু কম্পমান একটি হাত হযরত খালিদের সামনে তুলে ধরে বলে-"শরীরে একটু শক্তি থাকলেও আমি ঐ যুদ্ধে নিজ গোত্রের সাথে থাকতাম।... যেদিন আমার গোত্র মদীনা হতে পশ্চাদপসারণ করে ফিরে আসে সেদিন আমার অশ্রু বেরিয়ে পড়েছিল। ... যদি কা'ব বিন আসাদ বেঈমানী না করত এবং মদীনায় তিন-চারটি গেরিলা আক্রমণ চালাত তবে বিজয় নিশ্চিত আমাদেরই হত।"

হযরত খালিদ (রা.) উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি আবু যুরাইযের প্রতি ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকান এবং চুপ থাকেন।

"ইউহাওয়া নাম্নী এক ইহুদী নারী যারীদ বিন মুসাইয়্যিব নামক তোমার গোত্রের এক লোককে মুহাম্মাদকে হত্যার উদ্দেশে প্রস্তুত করার ঘটনা তুমি শুনেছ?" আবু যুবাইর জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ।" হযরত খালিদ মাথা নেড়ে বলেন—"শুনেছি। ... বড় লজ্জা পাই যখন শুনি যারীদ আমার গোত্রের লোক ছিল।...এখন সে কোথায়? এক বছরেরও বেশী হয়ে গেল তার কোন হদিস মিলল না। শুনেছি ইউহাওয়া তাকে সাথে করে ইহুদী জাদুকর লাঈছ বিন মোশানের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। মোশান মুহাম্মাদকে হত্যার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলে। কিন্তু মুসলমানদের তলোয়ারের সামনে লাঈছের জাদু অসহায় হয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী খন্দক হতে ফিরে সোজা বনূ কুরাইযার বসতি অবরোধকালে লাঈছ, ইউহাওয়া ও যারীদ সেখানে ছিল। কা'ব বিন আসাদের সহযোগিতায় এ তিনজন খিড়কি-পথে কেটে পড়তে সক্ষম হয়। এরপরে আর কি হলো জানি না।"

"খিড়কি-পথে তিনজন বের হলেও দু'জন পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।" আবু যুরাইয পরবর্তী ঘটনা জানায়—"যারীদের মধ্যে লাঈছের জাদুর প্রভাব হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠলে যারীদ তাদের সাথে পালাতে অস্বীকার করে। বাধ্য হয়ে ইউহাওয়া এবং লাঈছ তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। ঠিক এ মুহূর্তে তারা অবরোধকারী একদল মুসলিম সৈন্যের চোখে পড়ে যায়। সৈন্যরা তাদের থামতে বললে ইউহাওয়া ও লাঈছ প্রাণ বাঁচাতে যারীদকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। যারীদ জাদুর প্রভাবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ছিল। সে মুসলিম সৈন্যের আওয়াজ পেয়ে তলোয়ার কোষমুক্ত করে সৈন্যের উদ্দেশে রওনা হয়। যারীদ যেতে যেতে রাসূল (সা.)-এর নাম ধরে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি ও তাঁকে হত্যার সংকল্পের কথা ব্যক্ত করে। এতে অবরোধকারী সৈন্যরা তীর ছুঁড়ে মারে এবং সে তীরের আঘাতেই যারীদ মারা যায়।" একটু দম ফেলে আবু যুরাইয আবার বলে—"লাঈছ এবং ইউহাওয়া জীবন নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেও এখন তার মধ্যে মাত্র একজন জীবিত আছে। আর সে হল লাঈছ।... শুধু লাঈছ বিন মোশানই জীবিত আছে।"

"আর ইউহাওয়া?" হযরত খালিদ গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে জানতে চান—"তার কি হল? সে এখন কোথায়?"

"সে এখন প্রেতাত্মায় পরিণত।" আবু যুরাইয বলে—"সে এক দীর্ঘ কাহিনী, মর্মান্তিক ঘটনা। তুমি শুনতে চাইলে খুলে বলতে পারি। ইউহাওয়াকে তুমি ভাল করেই চেন। সে মক্কাতেই থাকত। যদি বল যে, তাকে দেখে তোমার অন্তরে কখনো আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি এবং তোমার মাঝে উষ্ণ শিহরণ জাগত না তবে আমি বলব, তুমি মিথ্যা বলছ। খালিদ! তোমাকে কেউ জানায়নি, কেন গাতফান কুরাইশদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল? অন্যান্য গোত্রের নেতারাও কিভাবে আবু সুফিয়ানকে শীর্ষ নেতা হিসেবে বরণ করে নিল?...এটা ইউহাওয়া এবং তার মত আরো চারজন ইহুদী নারীর জাদু ছিল। তাদের জাদুবলেই 'অসম্ভব' 'সম্ভবে' পরিণত হয়েছিল।

ঘোড়া এবং উটগুলো চলছিল নিজস্ব গতিতে। উটের গলায় ঝুলানো ঘন্টা আবু যুরাইযের বাক-ভঙ্গির সাথে তাল মিলিয়ে জলতরঙ্গের মনোমুগ্ধকর মিউজিক সৃষ্টি করে চলছিল। হযরত খালিদ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল প্রতিটি শব্দ।

"যারীদ বিন মুসাইয়্যিব ইউহাওয়ার প্রেমডোরে বন্দী হয়ে গিয়েছিল।" আবু যুরাইয ইউহাওয়ার ঘটনা বলতে শুরু করে—"তুমি জান না ইবনে ওলীদ! ইউহাওয়া যারীদকে নিজের জাদুতে বন্দী করে সাথে নিয়ে গিয়েছিল। আমি

লাঈছ বিন মোশানকে চিনি। যুবক বয়সে আমাদের মাঝে গভীর বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। জাদুগিরি এবং নজরবন্দী তার পিতার বিশেষ জ্ঞান ছিল। পিতাই তাকে এই বিদ্যা উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে যায়।...তুমি আমার কথা শুনছ তো ওলীদের পুত্র না-কি বিরক্ত হচ্ছ?...কথা বলা ছাড়া এখন আমার কিছুই করার শক্তি নেই।"

হযরত খালিদ হেসে উঠে বলেন—"শুনছি আবু যুরাইয! মনোযোগ দিয়ে শুনছি।"

"এটা তো তোমার জানা আছে যে, মুসলমানদের পরিখা এবং প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের সৈন্যরা মদীনার অবরোধ তুলে নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হওয়ার পর যখন মুহাম্মাদ কালক্ষেপণ না করে বনূ কুরাইযার কেল্লা অবরোধ করে।" আবু যুরাইয গোড়া হতে শুরু করে—"তখন লাঈছ বিন মোশান, ইউহাওয়া এবং যারীদ কেল্লার মধ্যে ছিল। অবরোধের কথা জানতে পেরে তারা সুড়ঙ্গ পথে বাইরে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু পথিমধ্যে জনৈক মুসলিম সৈন্যের চোখে পড়ে যাওয়ায় নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে তারা যারীদকে ফেলে পালিয়ে যায়।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবু যুরাইয!" হযরত খালিদ বলেন—"এ ঘটনাও আমার জানা আছে যে, অবরোধের পর মুসলমানরা বনূ কুরাইযার পুরুষদের হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদের সাথে নিয়ে চলে যায়।"

"আমার কথা শুনতে শুনতে তুমি বিরক্ত হয়ে উঠেছ তাই না?" আবু যুরাইয হাসতে হাসতে বলে—"তুমি আমার সব কথা শুনছ না।"

"ঘটনা সেখান থেকে শুনাও।" হযরত খালিদ বলেন—"যেখান থেকে আমি ইতিপূর্বে শুনিনি। আমি এ পর্যন্ত জানি যে, লাঈছ বুড়ো জাদুকরের যাদুর প্রভাবে যারীদ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এক মুসলিম সৈন্যের তীরাঘাতে মারা যায় এবং লাঈছ ইউহাওয়াকে সাথে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।"

"এর পরের ঘটনা হলো" আবু যুরাইয বলে—"উহুদ পাহাড়ের মধ্যবর্তী যে বসতি ও লোকালয় আছে, তারা এক রাতে কোন মহিলার চিৎকার শুনতে পায়। তৎক্ষণাৎ বাহাদুর প্রকৃতির তিন-চারজন লোক ঘোড়ায় চেপে তলোয়ার-বর্শা নিয়ে দ্রুত ছুটে আসে। কিন্তু বহু খোঁজা-খুঁজির পরও কোন নারীর দেখা তারা পায় না এবং চিৎকারও থেমে যায়। তারা এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে চলে আসে।"

"চিৎকার মরুভূমির কোন শিয়াল কিংবা বাঘেরও তো হতে পারে।" হযরত খালিদ মাঝখানে বলে ওঠেন।

বাঘ এবং নারীর চিৎকারের মাঝে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। আবু যুরাইয বলে—"লোকজন এটাকে কোন মাজলুম নারীর আর্তচিৎকার মনে করেছিল। তারা শেষমেষ এই ভেবে চুপ হয়ে যায় যে, হয়ত ডাকাতদল কোন নারীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে থাকবে অথবা সে কোন জালেম স্বামীর স্ত্রী হবে। সফরে যাবার সময় স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে এমন চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু এই একই চিৎকার পরের রাতে আরেক এলাকার নিকট শোনা যায়। সেখানকার কতক লোকও চিৎকার শুনে ছুটে যায়। কিন্তু তাদের নজরেও কিছু পড়ে না। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয় রাতেও থেকে থেকে এমনি নারী চিৎকার শোনা যেত এবং রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে এক সময় খান খান হয়ে হারিয়ে যেত।...

অতঃপর পাহাড়ী লোকেরা আরো জানায় যে, পরে আর্তচিৎকারের সাথে সাথে নারীর এ করুণ আহ্বানও ভেসে আসতে থাকে—"যারীদ! তুমি কোথায়? এসো প্রিয়! আমি তোমার অপেক্ষায়!"-তথাকার লোকেরা যারীদ নামে কাউকে চিনত না। এলাকার প্রধান লোকেরা মন্তব্য করে যে, এটা কোন পুরুষের প্রেতাত্মা হবে, যা নারীরূপে চিৎকার করে ফিরছে।"

আবু যুরাইযের বলার ভঙ্গিতে দারুণ প্রভাব ছিল। যে কোন শ্রোতাকে সহজেই প্রভাবিত করত। কিন্তু হযরত খালিদের চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। এই প্রতিক্রিয়া শূন্যতাই অন্যতম প্রমাণ যে, গাতফান গোত্রীয় এই বুড়োর কথা তার মাঝে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

"লোকজন ঐ রাস্তায় চলাচল ছেড়ে দিয়েছে যেখানে এই চিৎকার প্রায়ই শোনা যেত।" আবু যুরাইয বলে, "একদিন ঘটে আশ্চর্য এক ঘটনা। দীর্ঘ সফররত দুই ঘোড়-সওয়ার দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এক লোকালয়ে হন্তদন্ত হয়ে পৌঁছে। ঘোড়ার শরীর ফুড়ে এমনভাবে ঘাম বের হয়, যেন সদ্য পানির মধ্য হতে উঠে এল। অশ্বারোহীদ্বয় যেমন ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল তেমনি ঠকঠক করে কাঁপছিল। তারা স্বাভাবিক হয়ে জানায়, এক উপত্যকার মাঝ দিয়ে গমনকালে তারা এক নারীকণ্ঠের এ আর্তনাদ শুনে—"যারীদ! দাঁড়াও! আমি আসছি।" অশ্বারোহীদ্বয় আওয়াজ যেদিক থেকে আসে সেদিকে চায়। একটি পাহাড়-চূড়ায় এক মহিলা দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করে এভাবে বলছিল। দূর থেকে তাকে যুবতীই মনে হয়। সে পাহাড় থেকে তাদের উদ্দেশে নিচে নামতে থাকলে অশ্বারোহীদ্বয় ভয়ে ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে দেয়।...

"সম্মুখের মরুপ্রান্তরটি বক্র এবং বাঁক খাওয়া ছিল। অশ্বারোহী দু'জন মরুচক্রের শিকার হয়। তিন-চার বার একই স্থানে চক্কর দিয়ে ফেরে। ভয়ে তারা

খেই হারিয়ে ফেলেছিল। এক মরুবাঁক পার হলে তাদের সম্মুখে ত্রিশ-চল্লিশ কদম দূরে এক যুবতী নারীকে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পায়। নারীটি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র এবং মাথার চুল ছিল এলোমেলো। রক্তশূন্যতার কারণে লাশের মত ফ্যাকাশে সাদা ছিল তার চেহারা। অশ্বারোহীদ্বয় থমকে দাঁড়ায়। নারীটি দু'হাত প্রসারিত করে সম্মুখ পানে দৌড় দেয় এবং বলে—"দীর্ঘদিন যাবত আমি তোমাদের দু'জনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছি।" অশ্বারোহীদ্বয় তার একথা শুনে ঘোড়া ঘুরিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে পালায়। বুড়ো আবু যুরাইয এ পর্যন্ত বলে চুপ করে থাকে এবং হযরত খালিদের প্রতিক্রিয়া বুঝতে চেষ্টা করে। হযরত খালিদকে আত্মস্থ ও আনমনা দেখে সে তার হাত হযরত খালিদের রানের উপর রেখে বলে—"আমি দেখেছি তোমার কাছে কোন আহার্য দ্রব্য নেই। তুমি চাইলে এখান থেকে প্রয়োজনীয় আহার গ্রহণ ও বিশ্রাম নিতে পার। আর কবে তোমার দেখা পাব, কে জানে। তোমার পিতা ওলীদ বিরাট ব্যক্তিত্বশালী লোক ছিল। বলতে গেলে আমার হাতেই তোমার জন্ম হয়। আমি তোমার আপ্যায়ন করতে চাই। ঘোড়া থামিয়ে নিচে নেমে আস।

অতঃপর কাফেলাটি সেখানে থেমে যায় এবং যাত্রাবিরতি করে।

॥ সাতষট্টি ॥

"ঐ নারীরূপটি কোন পুরুষ অথবা মহিলার প্রেতাত্মাই হবে।" আবু যুরাইয ভুনা গোশত হযরত খালিদের সামনে পেশ করতে করতে বলে—"খাও, ওলীদের পুত্র! ... এরপর ঘটে আরেক ভয়ঙ্কর ঘটনা। একটি এলাকায় জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি এমন অবস্থায় এসে ধপাস করে পড়ে যে, তার মুখমণ্ডলে ক্ষতের দীর্ঘ টানা রেখা ছিল। ক্ষতস্থান থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। তার পরিহিত বস্ত্র ছিল ছিন্ন ভিন্ন। শরীরের অন্যান্য স্থানেও আঘাতের চিহ্ন ছিল। লোকটি ধপাস করে পড়েই বেহুঁশ হয়ে যায়। আশে পাশের লোকজন তার ক্ষত ধুয়ে দেয় এবং চোখ-মুখে পানির ঝাপটা দেয়। কিছুক্ষণ পরে লোকটির হুঁশ ফিরলে সে জানায়, সে দুটি মরু পর্বতের মধ্যদিয়ে আসছিল। হঠাৎ এক পর্বতের উপর থেকে এক মহিলা চিৎকার করতে করতে এত দ্রুত নেমে আসে, যা কোন সাধারণ নারীর পক্ষে সম্ভব নয়।...

লোকটি এমনভাবে থমকে দাঁড়ায় যেন এক ভীষণ আতঙ্ক তার শরীরের সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়েছে। মহিলাটি এত দ্রুত আসে যে, নিজেকে সামলাতে পারে না। ঐ লোকটির সাথে ধাক্কা খায় এবং চিৎকার দিয়ে বলে—"তুমি এসে গেছ যারীদ। আমি জানতাম তুমি জীবিত। এসো এসো...।

"লোকটি তাকে জানায়, সে যারীদ নয়। কিন্তু মহিলা তার কথাকে পাত্তা না দিয়ে তার হাত বাহুবদ্ধ করে রীতিমত টানতে শুরু করে এবং বলে—"তুমি যারীদই। আমার যারীদ।" লোকটি তার বাহুবন্ধন হতে মুক্তির জন্য তাকে ধাক্কা দেয়। মহিলা পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। লোকটি তাকে কোন পাগলিনী মনে করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার মহিলাটি তার দিকে এমনভাবে অগ্রসর হয় যে, তার দাঁত বাঘের মত বাইরে বের করা ছিল এবং সে হাত এমনভাবে সামনে মেলে রাখে যে তার আঙ্গুলগুলো হিংস্র প্রাণীর পাঞ্জার মত বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। লোকটি মহিলাটির এ রূপে ভয় পেয়ে উল্টা পায়ে পিছু হঁটতে থাকে। আচমকা এক পাথরে হোঁচট খেয়ে মাটির দিকে পিঠ করে পড়ে যায়। মহিলাটি তাকে উঠার সুযোগ না দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বাঘ যেমন শিকারকে পাঞ্জার মধ্যে নেয় তেমনি সেও তার পাঞ্জা ঐ লোকটির চেহারার উপর রেখে নখ দিয়ে নির্দয়ভাবে গভীর আঁচড় কেটে দেয়।...

লোকটি মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজের শরীরকে তার নিচ থেকে বের করে আনে। কিন্তু মহিলা লম্বা লম্বা নখগুলো লোকটির পার্শ্বদেশে বসিয়ে দেয়। পরিহিত বস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। চামড়াও মারাত্মকভাবে জখম করে। আহত লোকটি আরো জানায়, মহিলার চোখ এবং মুখ থেকে আগুনের শিখা বের হওয়ার মত লাগে। এ পশুসুলভ আচরণে লোকটি তাকে মানুষরূপ হিংস্র জন্তু মনে করে। লোকটির কাছে খঞ্জর ছিল। কিন্তু তার অনুভূতি এমনভাবে হারিয়ে যায় যে, সে খঞ্জর বের করার কথাও ভুলে যায়। দস্তাদস্তির এক পর্যায়ে মহিলাটির চুল তার হাতের নাগালের মধ্যে এসে যায়। সে চুল মুঠোর মধ্যে নিয়ে এমন জোরে ঝাঁকি দেয় যে, মহিলাটি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়। এই সুযোগে লোকটি পড়িমরি ছুট দেয়। পশ্চাৎ হতে ঐ মহিলার চিৎকার তার কানে ভেসে আসতে থাকে। সে ভয়ে পিছে ফেরে না; রুদ্ধশ্বাসে সম্মুখ পানে দৌড়াতে থাকে। সে মোটেও বলতে পারে না যে, কিভাবে সে এই লোকালয়ে এসে পৌঁছল। চেহারার ক্ষতের কারণে সে বেহুঁশ হয় না; চরম আতঙ্কই তার হুঁশ কেড়ে নেয়।

এর কিছুদিন পর দু'মুসাফির জানায়, তারা রাস্তায় এক ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখেছে। লাশের অবস্থা বলে, কোন হিংস্র প্রাণীর শিকারে সে মারা গেছে। মুসাফিররা আরো জানায়, মৃতের বস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন এবং সারা শরীরে নখের আঁচড় ছিল। মহিলাটি যেখানে থাকত বলে জানা যায় তার ধারে কাছে একটি

ছোট্ট বসতি ছিল। সেখানকার লোকজন স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সেখানে লাঈছ বিন মোশান পৌঁছে যায়। কিভাবে যেন সে জানতে পারে যে, এই এলাকায় একটি মহিলা যারীদ, যারীদ বলে ডাকে এবং চিৎকার দেয়। কাউকে হাতের কাছে পেলে দারুণভাবে আহত করে ছাড়ে।"

॥ আটষট্টি ॥

আবু যুরাইয আবশিষ্ট কাহিনী এভাবে বর্ণনা করে, প্রেতাত্মা সম্পর্কে তার ভীষণ কৌতূহল ও আগ্রহ ছিল। লাঈছ বিন মোশানও ছিল তার পরিচিত। যখন সে জানতে পারে যে, এই ইহুদী জাদুকর প্রেতাত্মার ঘটনাস্থলে গিয়েছে তখন সেও ঘোড়ায় চড়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছে। দু'তিন এলাকায় জিজ্ঞাসা করতে করতে সে ঐ এলাকায় উপস্থিত হয় যেখানে লাঈছ এসে অবস্থানরত ছিল।

"আবু যুরাইয!" বুড়ো লাঈছ দাঁড়িয়ে হস্ত প্রসারিত করতে করতে বলে—"তুমি এখানে কিভাবে এলে?"

"আমি এই খবর শুনে এসেছি যে, তুমি ঐ প্রেতাত্মাকে কাবু করতে এখানে এসেছ।" আবু যুরাইয তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হতে হতে বলে—"আমি যা শুনেছি তা-কি সত্য যে, এটা প্রেতাত্মা হোক বা অন্য কিছু হোক দু'তিনজন লোককে মারাত্মক আহত করেছে?"

"সে প্রেতাত্মা নয় প্রিয় দোস্ত!" লাঈছ বিন মোশান কথাটি অত্যন্ত দুঃখ ও ভারাক্রান্ত আওয়াজে বলে—"সে খোদার খাঁটি প্রেমিক এক যুবতী। সে নিজের যৌবন, রূপ এবং জীবন ইহুদী স্বার্থে ওয়াক্ফ করে রেখেছিল। হতভাগীর নাম ইউহাওয়া।"

"আমি মক্কায় কয়েকবার তাকে দেখেছি।" আবু যুরাইয বলে—"তার কিছু সত্য-মিথ্যা ঘটনাও শুনেছি। এর মধ্যে এটাও রয়েছে যে, সে যারীদ নামক এক কুরাইশ তোমার কাছে নিয়ে গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যার জন্য প্রস্তুত করেছিল। আমি এটাও শুনেছি যে, তুমি এবং ইউহাওয়া মুসলমানদের অবরোধ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে আর যারীদ পিছে রয়ে যায়। ...যদি ইউহাওয়া জীবিত থাকে এবং প্রেতাত্মা না হয়ে গিয়ে থাকে তবে তার এ দুর্গতি কিভাবে হল?

"সে নিজের সবকিছু খোদার নামে উৎসর্গ করে রেখেছিল।" লাঈছ বিন মোশান বলে—"কিন্তু তারপরেও সে একজন মানুষই ছিল। দেহে ছিল ভরা যৌবন। সে যৌবনের তুফানের কাছে হেরে যায়। যারীদের প্রেম অন্তরে ঠাঁই দেয়। আমার জাদু-মন্ত্রের প্রভাব যারীদের উপর যতটুকু ছিল, ইউহাওয়ার আন্তরিক ভালবাসার প্রতিক্রিয়াও ঠিক ততটুকু ছিল।"

"বুঝেছি।" আবু যুরাইয বলে—"যারীদ বিন মুসাইয়্যিবের মৃত্যু তাকে উন্মাদিনী করেছে।...তোমার জাদুবিদ্যা এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞান এই নারীর উপর চালানো যায় না?"

লাঈছ বিন মোশান দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে এবং শূন্য দৃষ্টিতে আবু যুরাইযের দুই কাঁধে দু'হাত রেখে ঝুঁকে তাকায় এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—"আমার জাদু তার কাছে ফেল। সে ছিঁড়ে খেতে আমার উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমার জাদু ঠিকই কাজ করত যদি আমি তার চোখে চোখ রাখতে পারতাম এবং আমার হাত ক্ষণিকের জন্য হলেও তার মাথার উপর থাকতে পারত।"

"প্রেমবিদ্যা সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি বা বুঝি তার আলোকে বলছি।" আবু যুরাইয বলে—"সে অনেক আগে থেকেই যারীদের প্রেমে পাগল ছিল। ফলে তোমার কারণে যারীদকে হারিয়ে সে তোমাকে শত্রু বলে জ্ঞান করে।"

"হ্যাঁ, আমাকে শত্রু ভাবার তার একমাত্র কারণ হলো, আমি যারীদকে আমাদের সাথে না নিয়ে এসে মুসলমানদের দয়ার উপর ছেড়ে এসেছিলাম।" লাঈছ বিন মোশান বলে, "আমি তাকে সাথে আনতে পারতাম। কিন্তু সে আমার তেলেসমাতির প্রতিক্রিয়ায় এতই প্রভাবিত হয়ে পড়ে যে, তাকে জোরপূর্বক আনতে গেলে আমার কিংবা ইউহাওয়াকে হত্যা করার সম্ভাবনা ছিল। আমি তার মগজে হিংস্রতার এমন প্রভাব চাঙ্গা করে দিয়েছিলাম যে, সে হত্যা এবং রক্তপাত ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে পারত না। একটি বৃক্ষের প্রতি ইশারা করে যদি বলতাম, 'এই যে মুহাম্মাদ', তবুও সে তলোয়ার দ্বারা ঐ বৃক্ষে আক্রমণ করত। তাকে ছেড়ে যাওয়ার পিছেও আমার এই আশা ছিল যে, হয়ত সে কোনভাবে মুহাম্মাদ পর্যন্ত পৌঁছে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে নিজেই নিহত হয়।"

"এখন কি ইউহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে?" আবু যুরাইয লাঈছকে জিজ্ঞাসা করে।

"তাকে বাগে আনার ব্যাপারে আমি এখনও আশাবাদী।" লাঈছ বিন মোশান আবু যুরাইযের প্রত্যুত্তরে বলে।

"আমাকে তোমার সাথে নিতে কোন অসুবিধা আছে?" আবু যুরাইয জিজ্ঞাসা করে এবং বলে—"আমি কৌতূহল নিবৃত্ত করতে চাই। কিছু শিখতে চাই মাত্র।"

"বার্ধক্য বাধ না সাধলে যেতে চাইলে চল।" লাঈছ বিন মোশান বলে, "অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি রওনা হব। এলাকার কিছু লোকও আমার সাথে যেতে প্রস্তুত।"

॥ উনসত্তর ॥

"অতঃপর এই ইবনে ওলীদ!" বুড়ো আবু যুরাইয এ পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে বলে পাশে বসা হযরত খালিদের কাঁধে হাত রেখে আবেগভরা কণ্ঠে বলে— "আমরা দুই বুড়ো উটে চড়ে ঐ পাহাড়ের দিকে রওনা হই, যেখানে একটি নারীর উপস্থিতির কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমরা সংকীর্ণ এক উপত্যকায় প্রবেশ করি। আমাদের পেছনে ১০/১২ অশ্বারোহী এবং ৩/৪ উষ্ট্রারোহী ছিল। উপত্যকায় প্রবেশের সময় সবাই ধনুক প্রস্তুত করে তাতে তীর সংযোজন করে নেয়। উপত্যকাটি সামনের দিকে গিয়ে প্রশস্ত হয়ে যায়। আমরা ডান দিকে মোড় নিলে লাশ ভক্ষণরত কয়েকটি শকুন নজরে পড়ে। শকুনদের মাঝ হতে একটি মরু শিয়াল দৌড়ে বের হয়। আমি তার মুখে মানুষের একটি হাত দেখি। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হই। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে আরো দুটি শিয়াল দৌড়ে পালায় এবং শকুনের দল উড়ে যায়। সেখানে মানুষের হাড় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পড়ে ছিল। মুণ্ডু ছিল আলাদা। লাশের লম্বা লম্বা চুল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিল। মস্তকের খুলির সাথেও কিছু ছিল। চেহারার অর্ধেকাংশে তখনও চামড়া ছিল।...লাশটি ছিল ইউহাওয়া। লাঈছ বিন মোশান দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তার বিক্ষিপ্ত হাড়গোড় এবং অর্ধেক খাওয়া চেহারা দেখতে থাকে। তার চোখ থেকে অশ্রুধারা বেয়ে তার দুধের মত সাদা দাড়িতে জমে যায়। আমরা অনন্তর ফিরে আসি।"

"লাঈছ বিন মোশান এবং ইউহাওয়া যারীদ বিন মুসাইয়্যিবকে মুহাম্মাদের হত্যার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছিল।" হযরত খালিদ কথাটি এমন ভঙ্গিতে বলে যার মধ্যে হাল্কা তিরস্কারের ছোঁয়াও ছিল—"যারীদ মুসলমানদের হাতে নিহত হয় আর ইউহাওয়ার পরিণাম তো তোমরা নিজ চোখেই দেখেছ।...এসব থেকে কিছু অনুধাবন করেছ আবু যুরাইয?"

"হ্যাঁ, আমি বুঝেছি।" বুড়ো আবু যুরাইয জবাবে বলে, "লাঈছের জাদু থেকে মুহাম্মাদের জাদু অধিক শক্তিশালী এবং প্রভাবপূর্ণ। মানুষ ঠিকই বলে যে, মুহাম্মাদের হাতে জাদু আছে। এই জাদুরই নৈপুণ্য যে, মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে তার ধর্ম গ্রহণ করে চলছে।...আর যাই বল, হত্যা যারীদেরই প্রাপ্য ছিল।"

"প্রিয় বন্ধু!" হযরত খালিদ বলেন—"ঐ প্রেতাত্মার ঘটনা নিশ্চয় মদীনায় পৌঁছে থাকবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস সেখানে কেউ এত ভীতু হবে না। ভীত

হওয়া তো দূরের কথা মুহাম্মাদের ভক্তরা এটাও হয়ত বিশ্বাস করবে না যে, এটা কোন জিন, ভূত বা প্রেতাত্মা।"

"মুহাম্মাদের ভক্তদের ভয় পাওয়ারই বা কি প্রয়োজন।" আবু যুরাইয বলে— "মুহাম্মাদের জাদু মদীনার চারদিকে বেষ্টিত। মুহাম্মাদকে কখনই হত্যা করা যাবে না। সে উহুদ যুদ্ধে মারাত্মক আহত হয়েও যথারীতি জীবিত থাকে। তোমাদের এবং আমাদের সৈন্য মিলে বিশাল বাহিনী মদীনার এক একটি ইট খুলে নিতে গেলে এমন ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয় যে, আমাদের সৈন্যরা পড়িমরি করে পালিয়ে যায়। রণাঙ্গনে যেই মুহাম্মাদের সামনে গেছে সেই হাতিয়ার সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।...আরো একবার মুহাম্মাদের হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কথা জান?"

"শুনেছি।" হযরত খালিদ বলেন—"পুরোপুরি জানি না।"

"এটা খয়বারের ঘটনা" আবু যুরাইয বলে—"মুসলমানরা খয়বারে ইহুদীদের উপর আক্রমণ করলে তারা মোকাবেলায় একদিনও টিকতে পারে না।"

"ধোঁকাবাজ জাতি ময়দানে লড়তে পারে না।" হযরত খালিদ বলেন— "ইহুদীরা অসি নয়, মগজ চর্চায় অধিক পারঙ্গম। তারা আক্রমণ করে পিঠে, বুকে নয়।"

"তারা খয়বারে এমনই করে।" আবু যুরাইয বলে—ইহুদীরা মোকাবেলা যদিও করে কিন্তু পূর্ব হতেই তাদের মধ্যে 'মুহাম্মাদ ত্রাস' ছিল। আমি শুনেছি, মুসলমানরা খয়বারে আক্রমণ করতে এলে ইহুদীরা মোকাবেলায় নেমে আসে। তাদের কেউ কেউ মুহাম্মাদকে চিনত। একজন জোরে বলে ওঠে, 'মুহাম্মাদও এসেছে'। পরে আরেকজনও চিৎকার করে বলে, 'মুহাম্মাদও এসেছে'। ইহুদীরা লড়তে নামলেও তাদের মধ্যে 'মুহাম্মাদ ভীতি' এতবেশী সঞ্চারিত হয় যে, প্রতিরোধ ছেড়ে হাতিয়ার কে কার আগে সমর্পণ করবে এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।"

আবু যুরাইয হযরত খালিদকে খয়বার যুদ্ধের বিবরণ শুনিয়ে এক ইহুদী নারীর ঘটনাও শুনায়। খয়বার বিজয়ের পর রাসূল (সা.) সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং বনী আদীর ভাই আনসারীকে খয়বারের শাসক নিযুক্ত করেন। খয়বার বিজয়োত্তর এখানে গনীমতের মাল বণ্টন করার সময় রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—"ভবিষ্যৎ উম্মতের দারিদ্রের আশঙ্কা আমার না থাকলে প্রত্যেক বিজিত এলাকা মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। বিজিত অঞ্চল, দেশকে ভবিষ্যৎ উম্মতের জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাব।"

ইহুদীরা পরাজিত হলে রাসূল (সা.)-এর সাথে ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ শুরু করে দেয়। এমন এমন দৃশ্যের অবতারণা করে, যার প্রত্যেকটি প্রমাণ করে যে মুসলমানদের মহব্বতে ইহুদীদের অন্তর ভরপুর। খয়বারে অবস্থানকালীন সময়ে এক ইহুদী নারী রাসূল (সা.)-কে তার গৃহে খানার দাওয়াত দেয়। সে ভক্তি-শ্রদ্ধা এমন আবেগময় ভঙ্গিতে প্রকাশ করে যে, তাকে নিরাশ করা রাসূল (সা.) ঠিক মনে করেন না। তিনি মহিলার বাড়ি যান। তাঁর সাথে বিশর নামে এক সাহাবীও ছিলেন। ইহুদিনী যয়নব বিনতে হারেস রাসূল (সা.)-কে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় এবং তাঁর সামনে খানা পেশ করে। ইহুদিনী আস্ত দুম্বা ভুনা করেছিল। সে রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করে, দুম্বার দেহের কোন অংশ আপনার প্রিয়? রাসূল (সা.) বাহুর কথা বলেন। ইহুদিনী দুম্বার বাহু কেটে আনে এবং রাসূল (সা.)ও হযরত বিশর (রা.)-এর সামনে এনে রেখে দেয়।

হযরত বিশর (রা.) গোস্তের একটি টুকরা কেটে মুখে দিয়ে গিলে ফেলেন। রাসূল (সা.)ও একটি টুকরা মুখে দেন কিন্তু না গিলেই থু-থু করে ফেলে দেন।

"বিশর! খেয়ো না।" রাসূল (সা.) নিষেধ করেন, এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন—"এই গোস্তে বিষের মিশ্রণ রয়েছে।"

হযরত বিশর ইতিমধ্যেই এক টুকরা গলাধঃকরণ করায় গোস্তের সাথে সাথে বিষও তাঁর পেটে গিয়ে পৌঁছে।

"কি হে ইহুদিনী!" রাসূল (সা.) বলেন—"আমার কথা কি সত্য নয় যে, তুমি এই গোস্তে বিষ মিশ্রিত করেছ?"

ইহুদিনীর পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব হয় না। তার অপরাধের প্রমাণ সামনে এসে যায়। হযরত বিশর (রা.) গলায় হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ান এবং ঘুরে পড়ে যান। বিষ এত তীব্র ছিল যে, তিনি আর উঠতে পারেন না। বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মারা যান।

"মুহাম্মাদ! শুনে রাখ" ইহুদিনী গর্বের সাথে স্বীকার করে বলে—"খোদার কসম! এটা আমার দায়িত্ব ছিল। স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র।"

রাসূল (সা.) ঐ ইহুদিনী এবং তার স্বামীকে কতলের নির্দেশ দেন। খয়বারে ইহুদীদের সাথে তিনি যে সহানুভূতিমূলক আচার-আচরণ ও ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন এই ইহুদী নারীর জঘন্য মনোবৃত্তির কারণে তা পরিবর্তন করেন।

ইবনে ইসহাক লেখেন—"মারওয়ান বিন উসমান আমাকে জানায় যে, রাসূল (সা.) অন্তিম রোগে পীড়িত ছিলেন। তিনি ইন্তেকালের ২/৩ দিন পূর্বে তাঁর পাশে বসা উম্মে বিশরকে বলেছিলেন—"উম্মে বিশর! আমি আজও দেহে ঐ

বিষের প্রতিক্রিয়া অনুভব করছি যা খয়বারের জনৈকা ইহুদিনী গোস্তের সাথে মিশ্রিত করেছিল। আমি গোশত মুখে দিয়ে না গিলেই উগরে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই বিষের প্রতিক্রিয়া আজও রয়েছে। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, রাসূল (সা.)-এর অন্তিম পীড়ার কারণ এই বিষই ছিল।"

॥ সত্তর ॥

"মুহাম্মাদকে হত্যা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।" হযরত খালিদ বলেন।

"কতদিন!" আবু যুরাইয বলে—"তার জাদু আর কতদিন চলবে? একদিন না একদিন তাকে হত্যার শিকার হতেই হবে।... খালিদ!" আবু যুরাইয হযরত খালিদের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"মুহাম্মাদকে হত্যার কোন পরিকল্পনা তুমি করেছ?"

"কয়েকবার।" হযরত খালিদ জবাব দেন—"যেদিন আমার গোত্র বদরের ময়দানে পরাজিত হয় সেদিন থেকে নিজ হাতে মুহাম্মাদকে হত্যার ফিকিরে আছি। কিন্তু আমার কোন পরিকল্পনা কার্যকর হয় না।"

"পরিকল্পনা আমাকে বলবে কি?" আবু যুরাইয আগ্রহের সাথে বলে।

" কেন নয়?" হযরত খালিদ জবাবে বলেন—"খুবই সাধাসিধে পরিকল্পনা। আর তা হলো উন্মুক্ত ময়দানে সামনা-সামনি লড়াই করে মুহাম্মাদকে হত্যা করা। কিন্তু একটি বাহিনীর বিরুদ্ধে আমার একার পক্ষে লড়াই করা সম্ভব নয়। পরপর তিন যুদ্ধে আমরা পরাস্ত।

"খোদার কসম!" আবু যুরাইয হাসিতে ফেটে পড়ে বলে—"আমি ভাবতেও পারিনি যে, ওলীদের পুত্র এমন বোকা হতে পারে।...আমি ইহুদীদের মত গুপ্ত পরিকল্পনার কথা বলছি। আমি ধোঁকা-প্রতারণার পন্থার কথা বলছি। সামনা-সামনি লড়াইতে তুমি মুহাম্মাদকে কখনও হত্যা করতে পারবে না।"

"প্রতারণার মাধ্যমেও তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"প্রতারণা কখনো সফলতার মুখ দেখে না।"

বুড়ো আবু যুরাইয হযরত খালিদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তার উন্মুক্ত বক্ষে হাতের আঙ্গুলের মাথা স্থাপন করে বলে—"অন্য কারো প্রতারণা ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু ইহুদীদের প্রতারণা ব্যর্থ হবার নয়। কারণ হলো, শঠতা-প্রবঞ্চনা ইহুদীদের ধর্মের অংশ। আমি লাঈছ বিন মোশানের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার একটি উক্তি তোমাকে শুনাই। লোকটি বড়ই বিজ্ঞ। তার কথায় জাদু ভরা। সে তোমাকে কথার দ্বারাই জাদুগ্রস্ত করে দিতে পারে। সে বলে, বছরের পর বছর লেগে যাক,

এমনকি কয়েক শতাব্দীও যদি পেরিয়ে যায় তবুও পরিশেষে ইহুদীবাদেরই বিজয় হবে। দুনিয়ায় সফলতা অর্জন করলে একমাত্র প্রতারণাই সফল হবে। মুসলমানরা এখনও সংখ্যায় স্বল্প, ফলে তাদের মধ্যে একতা ও ঐকমত্য রয়েছে। এই সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাবে ইহুদীরা তখন তাদের পরস্পরের মাঝে এমন বিভেদ ও ফাটল সৃষ্টি করে দেবে যে, মুসলমানরা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। অথচ ঘুণাক্ষরেও তারা জানবে না যে, এর নাটের গুরু ইহুদীচক্র। মুহাম্মাদ তাদেরকে এক প্লাটফর্মে রাখতে আর কতদিনই বা জীবিত থাকবে!"

হযরত খালিদ (রা.) দাঁড়িয়ে পড়েন। আবু যুরাইযও উঠে দাঁড়ায়। হযরত খালিদ (রা.) দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দেন। আবু যুরাইয তার হস্তদ্বয় নিজের হস্তদ্বয়ে পুরে নেয়। পাঞ্জামর্দন করে হযরত খালিদ (রা.) তাঁর ঘোড়ায় চেপে বসেন।

"তুমি তো বলে গেলে না কোথায় যাচ্ছ?" আবু যুরাইয বিদায় মুহূর্তে তাঁর গন্তব্য জানতে চেয়ে বলে।

"মদীনা!" হযরত খালিদ (রা.) দৃঢ় কণ্ঠে বলেন।

"মদীনা?" আবু যুরাইয শক খাওয়ার মত আঁৎকে উঠে জিজ্ঞাসা করে— "সেখানে কি করতে যাচ্ছ? নিজের শত্রুর কাছে...।"

"আমি মুহাম্মাদের জাদু দেখতে যাচ্ছি।" হযরত খালিদ (রা.) তাঁর কথা পূর্ণ করতে না দিয়েই বলেন এবং ঘোড়া ছুটিয়ে দেন।

॥ একাত্তর ॥

কিছুদূর এগিয়ে হযরত খালিদ (রা.) পিছে ফিরে চান। আবু যুরাইযের কাফেলা চোখে পড়ে না। তিনি নিম্নভূমি ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছিলেন। ঘোড়ার গতি কমিয়ে দেন একটু। এ সময় তাঁর মনে হতে থাকে, এই আওয়াজ তার পশ্চাদ্ধাবন করছে—"মুহাম্মাদ ... জাদুকর।... মুহাম্মাদের জাদুতে শক্তি আছে।"

"না... না" তিনি মাথা ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে নিজে বলেন—"মানুষ যেটা বুঝতে সক্ষম হয় না তাকে জাদু বলে প্রচার করে। আর যার সামনে দাঁড়াতে পারে না তাকে জাদুকর বলে অভিহিত করে। ... তারপরেও...রহস্য অবশ্যই কিছু না কিছু আছেই।...মুহাম্মাদের মাঝে অলৌকিক কিছু অবশ্যই আছে।"

স্মৃতি তাঁকে কয়েকদিন পূর্বে টেনে নিয়ে যায়। আবু সুফিয়ান তাকে, ইকরামা এবং সফওয়ানকে ডেকে নিয়ে বলেছিল যে, মুসলমানরা মক্কা আক্রমণ করতে আসছে। দু'উষ্ট্রারোহীর মাধ্যমে আবু সুফিয়ান এ তথ্য জানে। তারা মুসলিম বাহিনীকে মক্কাপানে ধেয়ে আসতে দেখেছিল।

হযরত খালিদ (রা.) বাছাই করা ৩০০ অশ্বারোহী নিয়ে পথিমধ্যেই মুসলমানদের বাঁধা দিতে পাহাড়ের খাদে খাদে পূর্ব হতে ঘাপটি মেরে থাকতে রওনা হন। তিনি এ দুর্ধর্ষ বাহিনীকে তীব্রবেগে ছুটিয়ে নিয়ে যান। ত্রিশ মাইল দূরের একটি বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকা ছিল তার টার্গেট। তিনি এক সূত্রে জেনেছিলেন যে, মুসলিম বাহিনী 'কারাউল গামীম' থেকে এখনও কিছুটা দূরে। হযরত খালিদ (রা.) চাচ্ছিলেন, মুসলিম বাহিনী আসার পূর্বে এখানে পৌঁছতে।

মক্কা থেকে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী পাহাড় অধ্যুষিত একটি এলাকার নাম কারাউল গামীম। শত্রুর উদ্দেশে ওঁৎ পেতে থাকার জন্য স্থানটি বড়ই উপযোগী ছিল। মুসলিম বাহিনী ইতিপূর্বেই সেখানে পৌঁছে থাকলে হামলা চালানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত।

তিনি পথিমধ্যে মাত্র দুই স্থানে যাত্রাবিরতি করেন এবং অশ্বগুলোকে আরাম নেয়ার সুযোগ দেন। তিনি উভয় বিরতিস্থলে অশ্বারোহী বাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন—"এটা আমাদের জন্য কঠিন পরীক্ষা। গোত্রের মান-মর্যাদা আমাদের উপরই নির্ভরশীল। আমরাই পারি কেবল তা রক্ষা করতে। হুবল এবং উযযার মান আমাদেরই রাখতে হবে। পূর্ব পরাজয়ের চরম প্রতিশোধ নিতে চাই আমরা। কারাউল গামীমের পাহাড়ী চক্করে ফেলে যদি আমরা মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করতে না পারি তবে মক্কা নিশ্চিত মুসলমানদের পদানত হবে। আমাদের ভগ্নি, কন্যা তাদের বাঁদীতে পরিণত হবে। আমাদের সন্তান-সন্ততি তাদের গোলাম হয়ে যাবে। উযযা এবং হুবলের নামে শপথ কর যে, আমরা কুরাইশ এবং মক্কার অহংকার ও মর্যাদা রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করব।"

তিনশ সৈন্যের সবাই একযোগে গগনবিদারী শ্লোগান তোলে—"উযযা এবং হুবলের নামে আমরা জীবন বিলিয়ে দিব।... একজন মুসলমানও জীবিত ফিরে যাবে না।... কারাউল গামীমে মুসলমানদের রক্তগঙ্গা বইবে।..মুহাম্মাদকে জীবিত ধরে মক্কায় নিয়ে যাব। ... মুসলমানদের খুলি মক্কায় নিয়ে যাব।...কেটে খণ্ড খণ্ড করব।...নাম-নিশানা মুছে ফেলব।"

তিনশ সৈন্যের এই দৃপ্ত শপথে হযরত খালিদের বুক গর্বে ফুলে যায় এবং শির উঁচু হয়ে যায়। তিনি ওঁৎ পাতার জন্য বড়ই উপযুক্ত জায়গা বেছে নেন। নিশ্চিত কার্যকর পরিকল্পনা তিনি হাতে নেন। তিনি শুধু অশ্বারোহী বাহিনী এই উদ্দেশে নিয়ে যান যে, মুসলমানদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করবেন এবং হঠাৎ আক্রমণ করে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাবেন। মুসলমানদের অধিকাংশ ছিল পদাতিক। হযরত খালিদের বিশ্বাস ছিল যে, তিনশ দুর্ধর্ষ সৈন্য দ্বারা তিনি এক হাজার চারশ

মুসলমানকে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট করে ফেলবেন। নিজস্ব সমর পরিকল্পনা ও বিচক্ষণতার উপর তাঁর এত আস্থা ছিল যে, তীরন্দাজ বাহিনী আনারও প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। অথচ পাহাড়ী এলাকায় তীরন্দাজ বাহিনীকে উঁচু স্থানে স্থাপন করলে, নিচ দিয়ে অতিক্রমকারী মুসলমানদের তারা বেছে বেছে তীরাবদ্ধ করতে পারত।

॥ বাহাত্তর ॥

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনীকে কিছু সময়ের জন্য থামিয়ে আরেকবার তাদের প্রেরণা চাঙ্গা এবং প্রতিশোধস্পৃহাকে শাণিত করেন। স্বীয় বাহিনীর বীরত্বের উপর তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল।

মুসলিম বাহিনী তখনও দূরে ছিল। হযরত খালিদ (রা.) উষ্ট্রচালকের বেশে তিন-চারজন ব্যক্তিকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের অগ্রযাত্রা এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে হযরত খালিদকে অবহিত করছিল। কিছুক্ষণ পরপর তারা পালাক্রমে এসে মুসলমানদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জানাচ্ছিল। হযরত খালিদ (রা.) গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী বাহিনীর চলার গতি বৃদ্ধি করতে থাকেন। মুসলিম বাহিনী রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে স্বাভাবিক গতিতে কারাউল গামীমে হযরত খালিদের পাতা ফাঁদের দিকে এগিয়ে আসছিল।

হযরত খালিদ (রা.) এই তথ্যের মর্ম উদ্ধার করতে পারেন না যে, মুসলমানরা সাথে করে অনেক দুম্বা এবং বকরী নিয়ে আসছে। তিনি এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর বের করতে পারেন না যে, তারা মক্কা আক্রমণ করতে আসছে যখন তখন দুম্বা, বকরী কেন সাথে করে আনছে?

"তাদের মধ্যে হয়ত এই আশঙ্কা এসে থাকবে যে, অবরোধ দীর্ঘ হলে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।" হযরত খালিদের জনৈক সাথী অভিমত ব্যক্ত করে— "বাস্তবিকই এমন হলে তখন তারা এ সমস্ত পশুর গোশত খাবে।...এ ছাড়া এ সমস্ত পশু আর কিইবা কাজে লাগতে পারে।"

"বেচারাদের জানা নেই যে, তারা মক্কা পর্যন্ত পৌছতেই পারবে না।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"তাদের কষ্ট করে আনা দুম্বা-বকরী আমরা মজা করে খাব।"

॥ তেহাত্তর ॥

মুসলমানরা কারাউল গামীম থেকে পনের মাইল দূরে থাকতেই হযরত খালিদ (রা.) অভীষ্ট পাহাড় ভূমিতে এসে পা রাখেন। তিনি স্বীয় বাহিনীকে

পাহাড়ের পাদদেশে একে অপর থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করতে বলেন এবং ওঁৎ পাতার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে তিনি নিজে সামনে এগিয়ে যান। তিনি সামনের গিরিপথ পর্যন্ত যান, যেখান দিয়ে কাফেলা এবং সৈন্যরা আসা-যাওয়া করত। তিনি এ স্থান পূর্বে অনেকবার অতিক্রম করেছেন কিন্তু গিরিপথটি পূর্বে ঐ দৃষ্টিতে দেখেননি যে দৃষ্টিতে এখন দেখছেন।

তিনি এই গিরিপথের ডানে-বামের উঁচু স্থানে উঠে পর্যবেক্ষণ করেন। নিচে নেমে আসেন। মরু প্রান্তরের পিছনে যান এবং ঘোড়া লুকানোর এমন স্থান খুঁজে বের করেন, ইশারা পাওয়া মাত্রই যেখান থেকে অশ্বারোহী বেরিয়ে অগোচরে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

৬২৮ খৃস্টাব্দ। মার্চ মাসের শেষ দিন। শীতের মৌসুম হলেও হযরত খালিদ (রা.) এবং তার ঘোড়ার গা দিয়ে ঘাম টপটপ করে পড়ছিল। তিনি ঘাঁটি বেছে নিয়ে মোট বাহিনীকে কয়েক অংশে বিভক্ত করে ঘোড়া সমেত তাদেরকে গিরিপথের বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে ফেলেন। এতক্ষণ যারা গোয়েন্দাবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল তাদেরকে আর সামনে যেতে দেন না। কারণ, মুসলমানরা তাদের মূল পরিচয় জেনে যাবার আশঙ্কা ছিল।

পল পল করে সময় বয়ে যায়। মুসলমানরাও কাছে এসে পড়ে। পাহাড়ী ফাঁদের অদূরে এসে তারা রাতের যাত্রাবিরতি করে।

॥ চুয়াত্তর ॥

পরদিন প্রভাতে ফযরের নামাযের পর মুসলমানরা রওনার জন্য যখন তৈরী হয় তখন এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে আসে।

"তোমার অবস্থা বলছে তুমি দৌড়ে দৌড়ে এখানে এসেছ।" রাসূল (সা.) বলেন—"এবং ভাল কোন সংবাদও আননি।"

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল!" মদীনার এই লোকটি বলে—"খবর ভালও নয় আবার বেশী মন্দও নয়।...মক্কাবাসীদের আচরণ সন্দেহপূর্ণ। আমি গতকাল থেকে কারাউল গামীমের পাহাড়ী এলাকায় ঘুরছি। খোদার কসম! তারা আমাকে দেখেনি, যাদেরকে আমি দেখে এসেছি। আমি তাদের পুরো গতিবিধি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেছি।"

"এরা কারা?" রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"কুরাইশরা ছাড়া আর কারা হবে"—লোকটি জবাবে বলে—"তারা সবাই অশ্বারোহী। গিরিপথের আশে-পাশের প্রান্তরে তারা চুপটি মেরে আছে।"

"তাদের সংখ্যা কত?" রাসূল (সা.) জানতে চান।

"তিন-চারশ'র মাঝামাঝি।" রাসূল (সা.)-এর ঐ গোয়েন্দা বলেন—"আমার চেনায় ভুল না হয়ে থাকলে তাদের নেতা খালিদ বিন ওলীদ। তাঁর কর্মব্যস্ততা এবং ছোটাছুটি আমি সারাদিন চুপে চুপে দেখেছি। আমি তাঁর এত নিকটে যাই যে, সে আমাকে দেখলেই হত্যা করে ফেলত। খালিদ অশ্বারোহী দলকে গিরিপথের আশে-পাশে ছড়িয়ে দিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। আমার ধারণা মিথ্যা না হলে বলব, সে আমাদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে আছে।"

"আমাদের আগমনের খবর মক্কাবাসী পেয়ে থাকলে তারা মনে করবে যে, আমরা মক্কা অবরোধ করতে এসেছি।" সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে একজন বলেন।

"ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যার কুদরতি হাতে আমাদের সকলের জীবন।" রাসূল (সা.) বলেন—"কুরাইশরা আমাকে যুদ্ধের প্রতি আহ্বান করলেও আমি তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হব না। যে অভিলাষ নিয়ে আমরা রওনা করেছি তা পরিবর্তন করব না। আমাদের লক্ষ্য মক্কায় গিয়ে উমরা সম্পন্ন করা মাত্র। এই দুম্বা এবং বকরী শুধুমাত্র কুরবানী করার জন্য এনেছি। কুরাইশদের কারণে নিয়ত পরিবর্তন করে মহান আল্লাহ্ পাককে নারাজ করব না। আমরা রক্তপাত নয়, উমরা করতে এসেছি।"

"হে আল্লাহ্র রাসূল!" এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেন—"তারা গিরিপথে আমাদের গতিরোধ করলে শত্রুর রক্ত বইয়ে দেয়া তখনও কি আমাদের জন্য জায়েয হবে না?"

এক দুই পা করে সাহাবায়ে কেরাম এসে রাসূল (সা.)-এর পাশে জমায়েত হতে থাকে। সৃষ্ট পরিস্থিতি নিরাপদে উত্তরণের সম্ভাব্য উপায় নিয়ে মুক্ত আলোচনা হয়। রাসূল (সা.) উপযোগী মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিতেন।

দীর্ঘ আলোচনা শেষে রাসূল (সা.) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিশজন চৌকস অশ্বারোহী বাছাই করেন। তাদেরকে জরুরী দিক-নির্দেশনা দিয়ে সামনে পাঠান। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা কারাউল গামীম পর্যন্ত সতর্কতার সাথে যাবে। কিন্তু গিরিপথে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রধান কাজ হলো, খালিদ বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করা। যদি খালিদ বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করে তবে এভাবে রক্ষণাত্মক কৌশলী লড়াই করবে যে, ক্রমে পিছু হঁটে চারদিক ছড়িয়ে পড়বে। তাদের আচার-উচ্চারণ দ্বারা খালিদ বাহিনীকে এটা বুঝাবে যে, তারা মুসলমানদের অগ্রবাহিনী।

রাসূল (সা.) এক সাথে দু'টি কৌশল অবলম্বন করেন। খালিদ বাহিনীর চোখে ধুলা দিতে 'অগ্রবাহিনীর বেশে' বিশজন অশ্বারোহী তাদের দিকে প্রেরণ করেন। যাতে তারা এদের দেখে আশ্বস্ত হয় এবং এই অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে যে, পিছে মূল বাহিনী আসছে। সাথে সাথে তিনি অবশিষ্ট মুসলমানদের নিয়ে গতিপথ পরিবর্তন করেন। শত্রুর দৃষ্টি এবং অযথা রক্তপাত এড়াতে তিনি স্বাভাবিক রাস্তা পরিহার করে অস্বাভাবিক পথ বেছে নেন। এ পথ যেমনি দুর্গম ছিল তেমনি দীর্ঘও ছিল বেশ। পথ বন্ধুর হলেও সংঘর্ষ এড়ানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সবচে বড় যে সমস্যা প্রকট হয়ে সামনে আসে তা হলো, এই নতুন দুর্গম অস্বাভাবিক পথের লোকেশান মদীনাবাসীদের কারো জানা ছিল না।

নতুন যে পথে মুসলমানগণ পিল পিল করে এগিয়ে চলেছেন তা কুসুমাস্তীর্ণ কিংবা ফুলের কোন পথ ছিল না। এটা ছিল আরেক দুর্গম গিরিপথ। কান্তার মরুর এই এলাকার নাম জাতুল হানজাল। দুস্তর পারাবার সত্ত্বেও রাসূল (সা.) সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে প্রবেশ করেন। মুসলিম বাহিনী এখন এমন পথ মাড়াচ্ছেন যাকে বাস্তবিক অর্থে স্থলপথ বলা যায় না। এটা ছিল অমসৃণ পাহাড় তরঙ্গ। এ পথ দিয়ে কেউ চলাফেরা করত না। আর তা চলাচলের যোগ্যতা ছিল না।

॥ পঁচাত্তর ॥

হযরত খালিদের দৃষ্টি মুসলমানদের অগ্রবর্তী দলটির উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু অগ্রবর্তী বিশ অশ্বারোহী গিরিপথের অদূরে এসে থেমে যায়। মাঝে মধ্যে দু'তিন অশ্বারোহী গিরিপথের মুখ পর্যন্ত আসত এবং এদিক-ওদিক দেখে ফিরে যেত। যদি এই বিশজন একত্রেও গিরিপথে প্রবেশ করত তবুও হযরত খালিদ (রা.) তাদের কিছু বলতেন না। নিরাপদে অতিক্রম করতে দিতেন। কারণ তার আসল শিকার ছিল পিছে। এই বিশজনের উপর আক্রমণ করে তিনি ওঁৎ পেতে থাকার খবর আগেভাগে রাষ্ট্র করতে চান না।

এটি বেশী দিনের পুরানো ঘটনা নয়। কয়েকদিন পূর্বের মাত্র। একদিকে বিশ অশ্বারোহীর থমকে যাওয়া অপরদিকে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মূল বাহিনী এখনও দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় হযরত খালিদ (রা.) দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। সময়ের সাথে সাথে তাঁর স্নায়ুচাপও বাড়তে থাকে। 'তাহলে কি মুসলমানরা যাত্রা মুলতবী করেছে? নাকি ওৎঁ পেতে থাকার খবর ফাঁস হয়ে গেছে?' এই প্রশ্ন তাঁকে অস্থির করে তোলে। এক সময় সহ্য করতে না পেরে তিনি এক উষ্ট্রারোহীকে ডেকে ছদ্মাবরণে বাইরে পাঠান এবং মুসলমানরা এখন কোথায় ও কি করছে তা জেনে আসতে বলেন।

বিশ মুসলিম অশ্বারোহী গিপিথের আশেপাশে নিয়মিত আনাগোনা অব্যাহত রাখে। এক-দু'বার গিরিপথের মুখে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার ফিরে যায়। কয়েকবার তারা অপর পাশ দিয়ে পাহাড়ে প্রবেশ করে। হযরত খালিদ (রা.) চুপে চুপে সেদিকে যান। কিন্তু সেখান থেকেও তারা এক সময় বেরিয়ে যায়। এভাবে বিভিন্ন কপট আচরণের মাধ্যমে বিশ মুসলিম অশ্বারোহী হযরত খালিদের দৃষ্টি তাদের দিকে নিবদ্ধ রেখে রাসূল (সা.)সহ মুসলমানদেরকে নিরাপদে খালিদ বাহিনী ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যেতে সহযোগিতা করেন। হযরত খালিদ (রা.) মূল বাহিনী শিকারের আশায় এই বিশজনকে হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দেন। খালিদ বাহিনী শিকার ধরতে হযরত খালিদের ইশারার অপেক্ষায় পাহাড়ের খাদে খাদে চুপটি মেরে বসে থাকে।

সূর্যাস্তের পর হযরত খালিদের প্রেরিত উষ্ট্রচালক-বেশী গোয়েন্দা ফিরে আসে।

"তারা সেখানে নেই।" গোয়েন্দা হযরত খালিদ (রা.)-কে রিপোর্ট দেয়।

"তোমার চোখ কি মানুষ দেখাও ছেড়ে দিয়েছে?" হযরত খালিদ (রা.) তিরস্কারের সুরে জিজ্ঞাসা করেন।

"কেবল তাদেরকে দেখতে পারে যারা বিদ্যমান থাকে।" উষ্ট্রচালক বলে— "যাদের না থাকার কথা বলছি তারা বাস্তবেও নেই। তারা অন্যত্র চলে গেছে। কোন্ দিকে গেছে, তা আমি বলতে পারি না।"

এ গোয়েন্দা রিপোর্ট হযরত খালিদ (রা.)-কে গভীর চিন্তার আবর্তে ঠেলে দেয়। ইতিমধ্যে পাহাড়ের উপর রাতের গাঢ় আঁধারের পর্দা চেপে বসায় এ মুহূর্তে তাঁর পক্ষে নতুন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ারও উপায় ছিল না। তিনি অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন। কোন বুদ্ধি তাঁর মাথায় আসে না। হঠাৎ তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওষ্ঠে দেখা দেয় হাসির ঝিলিক। মুসলমানদের অগ্রবর্তী যে দলটি গত কয়দিন ধরে এখানে রহস্যময়ভাবে ঘুরঘুর করছে তাদের গ্রেপ্তার করে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই অনুভব করেন যে, অগ্রবর্তী দলটিও আর আগের স্থানে নেই। অন্যদিন ঘোড়ার চিঁ-হি ধ্বনি ভেসে আসলেও আজ সে স্থানটি নীরব-নিস্তব্ধ।

॥ ছিয়াত্তর ॥

সকালে সূর্য যথারীতি হেসে ওঠে। মুঠি মুঠি আলো বিলিয়ে পৃথিবীকে আঁধারের কবল থেকে মুক্ত করে। কিছুক্ষণ পূর্বে যেখানে কালো আস্তরণ ছিল এখন সেখানে সোনালী আস্তরণ। এ প্রভাত মদীনাবাসীর জন্য আনন্দ বয়ে নিয়ে

এলেও খালিদ বাহিনীর ব্যর্থতার পরিসরকে আরো বৃদ্ধি করে। হযরত খালিদ (রা.) প্রভাত হতেই গিরিপথ থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। কিন্তু সহসা তাঁর মুখ মলিন হয়ে যায়। সারারাত যা ধারণা করেন তাই বাস্তব হয়ে সামনে আসে। অগ্রবর্তী দলটি লাপাত্তা। আশে-পাশে খুঁজেও তাদের কোন হদিস পাওয়া যায় না। নিজের ব্যর্থতা চরমভাবে অনুভূত হতে থাকে তাঁর। মনের ইচ্ছা এবং সমস্ত যুদ্ধ পরিকল্পনা মাটির সাথে মিশে যেতে দেখতে পান। একবার তাঁর মনে হয়েছিল, নিজেই আসফান পর্যন্ত গিয়ে খবর নিয়ে আসবেন। কিন্তু ধরা পড়ার আশঙ্কায় সে পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। চতুর্দিকে নজর রাখতে দুই-তিনজন সৈন্যকে উঁচু উঁচু পাহাড়ে অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দেন।

অর্ধেক দিন পার হয়ে যায়। সন্তোষজনক কোন খবর আসে না। মুসলমানদের অগ্রবর্তী বাহিনীর বিশ অশ্বারোহীরও হদিস পাওয়া যায় না। তাঁর আশা ছিল যে, অগ্রবর্তী বাহিনী আবার আসবে। কিন্তু না, তাদের টিকিটিও পাওয়া যায় না। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে তার এক অশ্বারোহী দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর কাছে এসে থামে।

"শীঘ্র আমার সাথে আসুন।" অশ্বারোহী দ্রুতকণ্ঠে বলে—"যা আমি দেখেছি তা আপনিও দেখবেন।"

"তুমি কি দেখেছ?" হযরত খালিদ (রা.) উদ্বেগের সাথে জানতে চান।

"উৎক্ষিপ্ত ধূলি।" অশ্বারোহী বলে—"খোদার কসম! এমন ধূলি কোন কাফেলার হতে পারে না। এটা কি হতে পারে না যে, তারা মুসলিম বাহিনী?"

হযরত খালিদ (রা.) তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে দেন এবং পাহাড়ী এলাকা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তিনি জমীন থেকে ধুলার মেঘ উঠতে দেখেন।

"খোদার কসম!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "মুহাম্মাদের মত বিচক্ষণ কুরাইশ গোত্রে একজনও নেই। সে আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।"

মুসলমানরা রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে কারাউল গামীমের অপর প্রান্ত দিয়ে মক্কার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। রাতে অগ্রবর্তী দলের বিশ অশ্বারোহীও বহুদূর ঘুরে পাহাড় অতিক্রম করে মূল বাহিনীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়া ঘুরিয়ে ছুটে চলেন। তিনি কারাউল গামীমের অভ্যন্তরে গিয়ে চিৎকার এবং ঘোড়া নিয়ে পায়চারি করতে থাকেন।

"সবাই বেরিয়ে এস।...মদীনাবাসীরা মক্কায় চলে গেছে। ...সকলে সামনে এস।"

মুহূর্তে তিনশ অশ্বারোহী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়।

"তারা আমাদের চোখে ধুলা দিয়ে গেছে।" হযরত খালিদ (রা.) অশ্বারোহীদের সম্বোধন করে বলেন—"তোমরা হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবে না যে, তারা অতিক্রম করে গেছে। কারণ, এই গিরিপথ ছাড়া এ এলাকা পার হওয়ার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। ... এখন আমাদের জীবন-মরণ নিয়ে খেলতে হবে। একটু অলসতা করলেই তারা মক্কা অবরোধ করে ফেলবে। তারা বাজিতে জিতে যাবে। বুদ্ধির পরীক্ষায় আমরা হেরে যাব।"

আজ মদীনায় যাবার সময় মদীনার উপকণ্ঠে পৌছে হযরত খালিদের আরো মনে পড়ে যে, মুসলমান কর্তৃক মক্কা অবরোধের আশঙ্কা তাঁর থাকলেও রাসূল (সা.)-এর এই অভাবিত চালে তিনি ধন্য ধন্য করে উঠেছিলেন। তিনি নিজেও বড় যুদ্ধবাজ এবং অনুপম কুশলী ছিলেন। তিনি পরে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, রাসূল (সা.) তাঁর বাহিনীকে ধোঁকা দিতে অগ্রবর্তী দলটি পাঠিয়েছিল। তারা সফলভাবে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়। বিশজনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়ে নিজে অন্য রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

"এটা জাদু নয়।" হযরত খালিদ (রা.) মনে মনে বলেন—"নেতৃত্ব আমার হাতে এলে আমিও এমন বিচক্ষণতা ও চাল দেখাতে পারি।"

এ কথা সত্য যে, হযরত খালিদের পিতা তাকে এমন যুদ্ধ ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণ দেয় যে, তাঁকে 'রণাঙ্গনের জাদুকর' বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু তিনি স্বীয় দক্ষতা ও প্রজ্ঞা কাজে লাগানোর সুযোগ পান না। কারণ, তাঁর নেতা ছিল আবু সুফিয়ান। সে শুধু গোত্রপতিই নয় গোত্রের সর্বাধিনায়কও ছিল। আবু সুফিয়ানের অধীনস্থ থাকায় তিনি নিজের পক্ষ হতে কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা কার্যকরী করতে পারতেন না। এই অপারগতাসুলভ দুঃখবোধই তাঁর অন্তরে আবু সুফিয়ানের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

॥ সাতাত্তর ॥

কয়েকদিন পূর্বেকার এ ঘটনাটি তাঁর এক এক করে মনে পড়ছিল। এক হাজার চারশ মুসলমান তাঁর ফাঁদকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মক্কাপানে এগিয়ে গিয়েছিল। তিনশ অশ্বারোহী নিয়ে পশ্চাৎ হতে আক্রমণের কোন চিন্তাই হযরত খালিদ (রা.) করেন না। কারণ তিনি জানতেন, যে মুসলমানরা সংখ্যায় স্বল্পতা সত্ত্বেও অধিক সংখ্যক শত্রুকে পরাস্ত করতে পারে, তাদেরকে এই তিনশ সৈন্য দ্বারা পরাভূত করা সম্ভব নয়। কেননা, বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা তাদের প্রায় চারগুণ।

তিনি কল্পনায় মক্কা হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখেন। এই ভয়ের তীরও তাঁর হৃৎপিণ্ডে খচখচ করে বিঁধতে থাকে যে, তার ফাঁদ ব্যর্থ হওয়ায় আবু সুফিয়ান তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করবে, তাকে ঠাট্টার পাত্রে পরিণত করবে। শুধু তাই নয়, কুরাইশদের পরাজয় এবং মক্কা পতনের জন্য তাঁকে দায়ী করা হবে।

হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনীকে একটি পথের ধারণা দিয়ে বলেন, মুসলমানদের পূর্বেই মক্কায় পৌঁছতে হবে। এ পথের দূরত্ব বেশী হলেও মুসলমানদের চোখ এড়ানো ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তিনশ অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। ভিন্ন পথের কারণে তিন মাইল দূরত্ব দেড় গুণ বৃদ্ধি পায়। হযরত খালিদ (রা.) চলার গতি বৃদ্ধির মাধ্যমে এই 'অতিরিক্ত দূরত্ব' পুষিয়ে নিতে প্রয়াসী হন।

হযরত খালিদের মনের চেয়ে অধিক বেগে ঘোড়া ছুটতে থাকে। উন্নত জাতের তাজি ঘোড়া সন্ধ্যার অনেক পূর্বেই মক্কা পৌঁছে যায়। সেখানে মুসলমানদের হাওয়াও তখনও পৌঁছেনি। মক্কার লোকজন অসংখ্য ঘোড়া আনাগোনার শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। আবু সুফিয়ানও বাইরে আসে।

"তোমাদের ফাঁদ সফল হয়েছে?" আবু সুফিয়ান প্রথম দফায় জানতে চায়।

"তারা ফাঁদে পা-ই দেয়নি।" হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়া হতে নামতে নামতে বলেন—"তুমি মক্কার চারপাশে এমন পরিখা খনন করাতে পার, মুহাম্মাদ মদীনায় যেমনটি করিয়েছিল।"

"তারা এখন কোথায়?' আবু সুফিয়ান ভয়াতুর কণ্ঠে জানতে চায়—"তাদের সম্পর্কে আমাকে কিছু জানালে ভাল হয় না?"

"যে সময় তুমি তাদের সম্পর্কে জানবে এবং পরবর্তী কর্তব্য নিয়ে ভাববে তার মধ্যে তারা মক্কা অবরোধ করে ফেলবে অনায়াসে।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"হুবল এবং উযযার মর্যাদার শপথ! তারা পাহাড় এর মরুর বুক চিরে চিরে আসছে। যদি তারা কারাউল গামীমের অপর কোন রাস্তা হয়ে আসে তাহলে তারা মানুষ নয়। কোন পদাতিক বাহিনী ঐ স্থান এত দ্রুত অতিক্রম করতে পারে না, যত দ্রুত তারা অতিক্রম করে এসেছে।"

"খালিদ!" আবু সুফিয়ান বলেন—"একটু ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা কর। খোদার কসম! ভয়ে তোমার কণ্ঠ কাঁপছে।"

"আবু সুফিয়ান!" হযরত খালিদ (রা.) ফুঁসে ওঠে বলেন—"তোমার গুণ বলতে শুধু এতটুকুই যে, তুমি আমার গোত্রপ্রধান। আমি তোমাকে স্পষ্ট বলতে চাই যে, তাদের পক্ষে মক্কার এক একটি ইট খুলে ফেলাও কোন কঠিন ব্যাপার

নয়।" হযরত খালিদ (রা.) একথা বলে মাথা উঁচু করলে তার অপর দুই সহসেনাপতি ইকরামা এবং সফওয়ানকে নিকটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। তিনি এবার তাদের সম্বোধন করে বলেন—"আজ ভুলে যাও তোমাদের নেতা কে? শুধু এতটুকু মনে রাখ যে, মক্কাপানে তুফান ধাবিত। নিজের ঐতিহ্য ও মান রক্ষা কর। এখানে দাঁড়িয়ে একে অপরের মুখের দিকে চেয়ে থেক না। মক্কা নগরী বাঁচাও। দেব-দেবীদের রক্ষা কর।"

॥ আটাত্তর ॥

মুহূর্তে সারা শহরে হুলস্থুল পড়ে যায়। যোদ্ধারা বর্শা, তীর-ধনুক এবং তলোয়ার নিয়ে মক্কা প্রতিরক্ষায় বেরিয়ে পড়ে। নারী এবং শিশুদের দুর্গ সদৃশ স্থানে স্থানে স্থানান্তর করা হতে থাকে। যুবতী নারীরাও যোদ্ধার বেশ ধারণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এটা কেবল তাদের শহর এবং জান-মালের নয় বরং তাদের মাজহাবেরও প্রশ্ন ছিল। এটা মূলত দু'টি চিন্তা চেতনা এবং আকীদা-বিশ্বাসের সংঘর্ষ হলেও হযরত খালিদের কাছে এটা ছিল নিজের ব্যক্তিত্ব এবং গোত্রের ঐতিহ্য ও মান-মর্যাদার প্রশ্ন। তাঁর গোত্র পুরো আরবে যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর পিতাকে আরবের লোকেরা 'সমরপতি' বলে অভিহিত করত। হযরত খালিদ (রা.) নিজ গোত্রের যশ-খ্যাতি এবং গোত্রীয় ঐতিহ্য জিন্দা ও সমুন্নত রাখার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

তিনি আবু সুফিয়ানকে এড়িয়ে যান। ইকরামা এবং সফওয়ানকে সাথে নিয়ে এমন চানক্য পরিকল্পনা করেন, যার সুবাদে তিনি মুসলমানদেরকে শহর থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হতেন। তিনি কিছু সংখ্যক সৈন্য এ উদ্দেশে বাছাই করেন, যারা শহর থেকে অনেক দূরে চলে যাবে এবং মুসলমানরা অবরোধ করলে পশ্চাৎ হতে অবরোধকারীদের উপর চড়াও হবে। কিন্তু বেশীক্ষণ অবস্থান করবে না। বরং অতর্কিতে আক্রমণ করে স্থানে স্থানে ফাটল সৃষ্টি করে মুহূর্তে উধাও হয়ে যাবে।

শহরে বিক্ষিপ্ততা এবং যোদ্ধাদের ব্যতি-ব্যস্ততা ও রণধ্বনির মাঝে কতক নারীর মিষ্টি-মধুর স্বরও ভেসে আসতে থাকে। সকলের আওয়াজ মিলে একটি আওয়াজের রূপ পায়। যাকে বলা হয় সম্মিলিত কণ্ঠ। এই সম্মিলিত গানের কথার মধ্যে রাসূল (সা.)-এর হত্যার উল্লেখও ছিল। আবেগ সঞ্চার এবং রক্তে তোলপাড় সৃষ্টিকারী গান ছিল। কণ্ঠশিল্পীরা মক্কার অলি-গলিতে এই গীত পরিবেশন করে বেড়ায়।

কয়েকজন সশস্ত্র উষ্ট্রারোহীকে মদীনা হতে আগমনের পথে এবং আরো সম্ভাব্য দু'তিন দিকে এ উদ্দেশে দ্রুত পাঠিয়ে দেয়া হয় যে, তারা মুসলমানদের অগ্রযাত্রার খবর মক্কায় পৌছাতে থাকবে। নারীরা উঁচু বাড়ির ছাদে উঠে মদীনার দিকে তাকাতে থাকে। সূর্য ক্রমে নিচে নামছিল। মরুর আভা বড় চমৎকার ও আকর্ষণীয় হয়। কিন্তু আজ মক্কার গোধূলি আভার মাঝে ছোপ ছোপ রক্ত দেখা যাচ্ছিল।

কোন প্রান্ত ও দিগন্ত হতে উৎক্ষিপ্ত ধূলি দেখা যায় না।

"তাদের এতক্ষণ এসে পড়ার কথা।" হযরত খালিদ (রা.) ইকরামা ও সফওয়ানকে বলেন—"আমরা এত দ্রুত পরিখা খনন করতে পারতাম না।"

"আমরা পরিখার সাহায্যে লড়ব না।" ইকরামা বলে।

"আমরা তাদের অবরোধের উপর আক্রমণ করব।" সফওয়ান বলে—"তাদের ঠিকমত দাঁড়াতে দিব না।

সূর্য ডুবে যায়। রাত ক্রমেই গভীর হতে থাকে। কিছুই ঘটে না।

মক্কা সারারাত জেগে থাকে। যেন আজ সেখানে রাতই হয়নি। নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে কেল্লা সদৃশ স্থানে স্থানান্তর করা হয়। আর যারা লড়তে সক্ষম তারা সেনাপতির নির্দেশে শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে স্থাপিত মোর্চা মজবুত করছিল।

রাত অর্ধেক পেরিয়ে যায় তথাপি মদীনার লোকদের আসার কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

এক সময় পুরো রাতও পেরিয়ে যায়।

॥ উনআশি ॥

"খালিদ!" আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করে—"কই তারা?"

"যদি তুমি মনে করে থাক যে, তারা আসবে না তবে নিঃসন্দেহে এটা একটা মারাত্মক ধোঁকা হবে; যার মধ্যে তুমি নিপতিত।" হযরত খালিদ (রা.) জবাবে বলেন—"মুহাম্মাদের মগজ পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই। যা সে চিন্তা করতে পারে তুমি তা পার না।...সে নিশ্চিত আসবে।"

এরই মধ্যে মুসলমানরা অন্যান্য গোত্রের বিরুদ্ধে আরো কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সর্বত্র নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। খয়বার যুদ্ধ এর মধ্যে অন্যতম। এ সমস্ত লড়াইয়ে অংশগ্রহণের ফলে তারা যুদ্ধ-অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

"আবু সুফিয়ান!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"উহুদে মুসলমানদের যে রূপে তুমি দেখেছিলে এখন সে রূপ ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। তারা এখন যে কোন রণাঙ্গন কাঁপাতে সক্ষম। সমর বিষয়ে তারা যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেছে। তাদের এখনও সামনে না আসাটাও একটি যুদ্ধ-কৌশল বৈ নয়।"

আবু সুফিয়ান কিছু বলতে মুখ খুলেছিল, ইতিমধ্যে দিগন্ত ফুঁড়ে এক উষ্ট্রারোহীর উদয় হয়। দ্রুতগামী একটি উট তাদের লক্ষ্যে ছুটে আসতে থাকে। উষ্ট্রারোহী আবু সুফিয়ান এবং হযরত খালিদের নিকটে এসে লাফ দিয়ে নিচে নামে।

"আমার চোখের দেখা হয়ত তোমাদের বিশ্বাস হবে না।" উষ্ট্রারোহী নেমেই বলে—"আমি মুসলমানদেরকে হুদায়বিয়ায় শিবির স্থাপন করে অবস্থান করতে দেখেছি।"

"সে মুহাম্মাদ এবং তার বাহিনী হতে পারে না।" আবু সুফিয়ান উষ্ট্রারোহীর দাবী প্রত্যাখ্যান করে বলে।

"খোদার কসম! আমি মুহাম্মাদকে তেমন চিনি যেমন তোমরা দু'জন আমাকে চেন।" উষ্ট্রারোহী বলে—"আমি আরো এমন কতিপয় লোকদের দেখেছি, যারা ইতিপূর্বে আমাদেরই লোক ছিল এবং পরে মুহাম্মাদের দলভুক্ত হয়েছে।"

মক্কা হতে তের মাইল পশ্চিমে একটি স্থানের নাম 'হুদায়বিয়া'। রক্তপাত পরিহার করতে রাসূল (সা.) মক্কা থেকে দূরবর্তী এই হুদায়বিয়া নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করেছিলেন।

"আমরা তাদের উপর রাতে গেরিলা আক্রমণ করব।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তাদেরকে স্বস্তিতে থাকতে দেব না। তারা যে রাস্তা ধরে হুদায়বিয়া গেছে,সে রাস্তা তাদের ক্লান্ত-অবসন্ন করে দিয়েছে। তাদের হাড় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম। তারা ক্লান্তি ঝেড়ে স্বাভাবিক হয়ে মক্কা আক্রমণ করবে। আমরা তাদেরকে বিশ্রামের সুযোগ দিব না।"

"আমরা তাদেরকে ওখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করতে পারি।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"গেরিলা বাহিনী তৈরী কর।"

॥ আশি ॥

রাসূল (সা.) শিবির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পূর্বেই সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। অশ্বারোহী ইউনিট রাতে শিবিরের চারপাশে টহল দিতে থাকে। দিনেও পাহারার ব্যবস্থা ছিল।

অশ্বারোহী টহল বাহিনী শিবিরের অনতিদূর দিয়ে আরেক অশ্বারোহী দলকে আস্তে আস্তে যেতে দেখে। মুসলিম টহল বাহিনী তাদের দিকে এগিয়ে যায়। অপর অশ্বারোহী দলটি ছিল কুরাইশদের গেরিলা বাহিনী। তারা কড়া প্রহরা দেখে বহুদূরে এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর অপর দিক দিয়ে ফিরে আসে এবং মুসলমানদের তাঁবু হতে কিছু দূরে একটু থেমে আবার চলে যায়।

দ্বিতীয় দিন কুরাইশ গেরিলা দলটি মুসলিম তাঁবুর আরো কাছে আসে। এ সময় মুসলমানদের একটি টহল বাহিনী টহল দিতে দিতে দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসে। তারা তাঁবুর পাশে কুরাইশদের দেখে ঘিরে ফেলে। কুরাইশ গেরিলা দলটি মুসলমানদের ঘেরাও থেকে মুক্ত হতে তলোয়ার কোষমুক্ত করে। টহল বাহিনীর তলোয়ার পূর্ব হতেই কোষমুক্ত ছিল। তারা ফুঁসে ওঠে। বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তাদের উপর। কিন্তু ইতিমধ্যে টহল বাহিনীর কমান্ডার এসে তার বাহিনীকে থামিয়ে দেয় এবং অস্ত্র সংবরণ করতে বলে।

"তাদের বেরিয়ে যেতে দাও।" টহল-কমান্ডার বলে—"আমরা যুদ্ধের অভিপ্রায়ে এসে থাকলে তাদের একজনকেও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দিতাম না।"

কমান্ডারের হস্তক্ষেপে গেরিলা দলটি নিরাপদে চলে যায় এবং আবু সুফিয়ানকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে।

"আরো কিছু অশ্বারোহী পাঠাও।" আবু সুফিয়ান বলে—"অন্তত একটি হামলা চালাও।"

"প্রিয় নেতা!" এক অশ্বারোহী বলে—"গেরিলা হামলা চালাতে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু মুসলমানদের তাঁবুর আশে পাশে রাতদিন পাহারাদার ঘুরঘুর করে বেড়ায়।"

কুরাইশদের পক্ষ থেকে আরো কিছু অশ্বারোহী গেরিলা হামলার উদ্দেশে প্রেরণ করা হয়। তারা সন্ধ্যার একটু পর গেরিলা হামলার উদ্যোগ নিলে মুসলিম টহল বাহিনী তাদের কতককে আহত করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়।

মক্কাবাসীদের মাঝে থমথমে অবস্থা বিদ্যমান থাকে। তারা রাতে নিদ্রাও যেত না। অবরোধের আশঙ্কায় সর্বক্ষণ জাগ্রত এবং সতর্ক থাকত। এভাবে একের পর এক দিন অতিবাহিত হতে থাকে। হঠাৎ একদিন এক মুসলিম অশ্বারোহী মক্কায় প্রবেশ করে। সে আবু সুফিয়ানের ঠিকানা জানতে চায়। উৎসুক জনতার ঢল নামে তার পিছু পিছু। আবু সুফিয়ানের উদ্দেশে সে কি বার্তা নিয়েছে তা জানতে সবাই সাথে সাথে চলতে থাকে। আবু সুফিয়ান আগন্তুককে দূর থেকে দেখে দৌড়ে আসে। হযরত খালিদ (রা.)ও আসেন।

"আমি আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মাদ (সা.)-এর বার্তা নিয়ে এসেছি।" মুসলমান অশ্বারোহী আবু সুফিয়ানকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করায় এবং বলে—"আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। উমরা করতে এসেছি মাত্র। উমরা সম্পন্ন করে ফিরে যাব।"

"অনুমতি না দেয়া হলে কি করবে?" আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করে।

আমরা মক্কাবাসী নয়; আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মান্য করি।" মুসলিম অশ্বারোহী বলে—"আমরা আমাদের এবং ইবাদতগৃহের মাঝে কাউকে অন্তরায় হতে দিই না। মক্কা ভূমিতে আমাদের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করলে মক্কা বিধ্বস্ত এবং ধ্বংসের নগরীতে পরিণত হবে। মক্কার অলি-গলিতে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।... আবু সুফিয়ান! আমরা ধ্বংস নয়; শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছি। নিরাপত্তার উপঢৌকন নিয়েই আমরা এখান থেকে ফিরে যেতে চাই।"

হযরত খালিদের ঐ মুহূর্তগুলো মনে পড়ছে, যখন এই মুসলিম অশ্বারোহী গম্ভীর কণ্ঠে তাদের ধমক দিচ্ছিল। হযরত খালিদের রক্তে আগুন ধরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কেন যেন তার রক্ত উত্তপ্ত হয় না। পূর্বের মতই শীতল থাকে। লোকটিকে তাঁর বড় ভাল লেগেছিল। তাঁর দৃঢ় উচ্চারণ এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর তাকে মোহিত করে। আবু সুফিয়ান মুসলিম অশ্বারোহীকে সেদিন যে জবাব দিয়েছিল তাও তাঁর খুব মনঃপূত হয়েছিল। আবু সুফিয়ান বলেছিল, উভয় পক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ একত্রে বসে সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত করবে।

॥ একাশি ॥

উভয় পক্ষের আলোচনা সাপেক্ষে 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে একটি সন্ধিপত্র প্রস্তুত হয়। মুসলমানদের পক্ষ হতে রাসূল (সা.) এবং কুরাইশদের পক্ষ হতে সুহাইল বিন আমর এ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এ সন্ধি মোতাবেক স্থির হয়েছিল যে, মুসলমান এবং কুরাইশদের মাঝে আগামী দশ বছরের মধ্যে কোন ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হবে না। মুসলমানরা এ বছর ফিরে গিয়ে আগামী বছর উমরা করতে আসবে এবং মক্কায় মাত্র তিনদিন অবস্থান করতে পারবে।

সন্ধির শর্তানুযায়ী মুসলামানরা ফিরে গিয়ে পরবর্তী বছর আবার আসে। রাসূল (সা.)সহ অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম এখন মক্কায়। সকলের দেহে উমরার বেশ। রাসূল (সা.) কুরাইশী ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) রাসূল (সা.)-কে ভাল করে চিনতেন। কিন্তু অনেক দিন পর আজ মক্কায় তাঁকে দেখে তাঁর মনে হতে থাকে, এ যেন অন্য কোন মুহাম্মাদ। রাসূল (সা.)-এর নূরানী চেহারা, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং অনুপম আচরণে তিনি এমন আকৃষ্ট ও মোহিত হন যে, তাঁর মাথা হতে এই

খেয়াল দূর হয়ে যায় যে, ইনি সেই ব্যক্তি যাকে সে নিজ হাতে হত্যার পরিকল্পনা তৈরি করত।

হযরত খালিদ (রা.) রাসূল (সা.)-কে একজন সেনাপতি হিসেবে বারবার দেখতে থাকেন। শ্রেষ্ঠ সমরবিদ হিসেবে তিনি তাকে স্বীকৃতি দেন। হুদায়বিয়া সন্ধি পর্যন্ত মুসলমানরা রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে ছোট-বড় আঠাশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একটি যুদ্ধে সাময়িক বিপর্যয় ছাড়া প্রতিটি যুদ্ধেই জয় ছিনিয়ে এনে সারা আরবে একচেটিয়া প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন।

মুসলমানরা নিরাপদে উমরা সম্পন্ন করে। ঠিক তিনদিন পরে তারা ফিরে যায়। কিন্তু এ সীমিত সময়ে তাদের আচার-আচরণ, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণদের অন্তরে নীরবে দাগ কাটে। এদের অন্যতম হলেন হযরত খালিদ (রা.)। মুসলমানরা মদীনায় চলে গেছে প্রায় দু'মাস হল। মুসলমানরা চলে যাওয়ার পর হযরত খালিদ (রা.) আরেক খালিদে রূপ নেন। তিনি এখন আগের মত মুসলমানদের বিরোধিতায় মুখে কথার খৈ ফুটান না। তার মস্তিষ্ক রাসূল (সা.)-এর হত্যার নিত্য-নতুন নীল নকশা প্রণয়ন করে না। দুনিয়ার কোলাহলপূর্ণ সরব জগত ছেড়ে ভাবের নীরব জগতে চলে যান। নীরবতার মাঝেই কাটে তাঁর অধিকাংশ সময়। কিন্তু এ নীরবতা ছিল ঝড়ের পূর্বাভাস। একটি আসন্ন প্রলয় ও এক মনোবিপ্লব লুক্কায়িত ছিল এ রহস্যময় নীরবতার অন্তরালে। হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন রণাঙ্গনের মানুষ। লড়াই ছিল তাঁর পেশা। যুদ্ধই ছিল তাঁর নেশা। যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া তিনি এতদিন কিছু বুঝেন নি, বুঝতে চাননি। স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম-কর্ম বলতে তিনি কিছু বুঝতেন না। যুদ্ধই ছিল তাঁর ধর্ম, অস্তিত্ব, প্রাণ সঞ্জীবনী শক্তি। ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। তাই এ ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবার প্রয়োজনও তিনি উপলব্ধি করেন না। যে ধর্মগত বিরোধের প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) ও কুরাইশদের মাঝে এত টানাপোড়েন, এত রক্তক্ষয় তা নিয়েও তিনি কখনও গভীরভাবে ভাবেন নি। তাঁর ধর্মের বাস্তবতা কতটুকু এবং মুহাম্মাদের আনীত ইসলামের মর্মবাণী কি-তা তিনি কখনও সত্যের নিরিখ ও যুক্তির কষ্টিপাথরে পরখ করে দেখেন নি। আজ নতুন করে তাঁর মাঝে ভাবান্তর ঘটে। কাছ থেকে মুসলমানদের দেখাই ছিল এ ভাবান্তরের সূচনা। একদিকে মুসলমানদের নান্দনিক স্বাচ্ছন্দময় জীবন অপরদিকে তাদের গতানুগতিক জীবন তাঁকে শুরু থেকে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। আরবের পৌত্তলিক ধর্ম সঠিক না কি মুহাম্মাদের প্রচারিত ইসলাম ধর্ম বাস্তবভিত্তিক এ প্রশ্নটি তাঁর মনের মুকুরে গভীরভাবে উত্থিত হয়। ধর্ম-বিশ্লেষণের প্রতি তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি পতিত হয়। মানব

জীবনে ধর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতাই বা কতটুকু এটাও তাঁর গবেষণার অন্তর্গত ছিল।

"ইকরামা!" হযরত খালিদ (রা.) চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং দীর্ঘ গবেষণার পর লব্ধ তত্ত্ব তাঁর অন্যতম সহসেনাপতি সাথী এবং পারিবারিক সূত্রে তাঁরই ভাতিজা ইকরামাকে জানাতে বলেন—"আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ... আমি বুঝে গেছি।"

"কি বুঝে গেছ খালিদ!" ইকরামা উৎসুক হয়ে জানতে চায়।

"মুহাম্মাদ জাদুকর নয়।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"এবং সে কবিও নয়। মুহাম্মাদকে শত্রুভাবা আমি ছেড়ে দিয়েছি। শুধু তাই নয়, আমি মুহাম্মাদকে আল্লাহ্র রাসূল বলেও মেনে নিয়েছি।"

"হুবল এবং উযযার শপথ! তুমি ইয়ার্কি করছ বৈ নয়!" ইকরামা বলে—"কেউ বিশ্বাস করবে না যে, ওলীদের পুত্র বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করছে।"

"ওলীদের পুত্র পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করে ফেলেছে।" হযরত খালিদ (রা.) দৃঢ় কণ্ঠে বলেন।

"মুহাম্মাদ আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, তা কি তুমি ভুলে গেছ?" ইকরামা বলে—"তুমি তার ধর্ম গ্রহণ করতে চলেছ, আমরা যার রক্ত পান করতে উদগ্রীব!"

"তুমি যাই বল না কেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।" হযরত খালিদ (রা.) স্পষ্ট ভাষায় তাঁর অবস্থান জানিয়ে বলেন—"আমি বুঝে-শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল।"

ঐদিন সন্ধ্যায় আবু সুফিয়ান হযরত খালিদ (রা.)কে তার বাসভবনে ডেকে নেয়। ইকরামাও সেখানে উপস্থিত ছিল।

"মুহাম্মাদের কথার মারপ্যাঁচে তুমিও আটকে গেছ?" আবু সুফিয়ান হযরত খালিদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করে।

"তুমি সত্যিই শুনেছ আবু সুফিয়ান!" হযরত খালিদ (রা.) নির্ভীক কণ্ঠে বলেন—মুহাম্মাদের কথাই অনেকটা এমনই; গভীর প্রভাবপূর্ণ।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ওকিদী লেখেন, আবু সুফিয়ান গোত্রপ্রধান হওয়ায় সে তাঁকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বলে। অন্যথা তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়। হযরত খালিদ (রা.) আবু সুফিয়ানের হুমকি মুচকি হেসে উড়িয়ে দেন। কিন্তু পাশে বসা হযরত খালিদের ভাতিজা আবু সুফিয়ান কর্তৃক চাচার এই অপমান সহ্য করতে

পারে না। অথচ ইকরামা নিজেও হযরত খালিদের সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী ছিল।

"আবু সুফিয়ান!" ইকরামা ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলে—"আমি তোমাকে গোত্রপ্রধান স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে খালিদকে যে ভাষায় তুমি হুমকি দিয়েছ তা সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি খালিদকে ধর্মান্তরিত হতে বাঁধা দিতে পার না। তারপরেও যদি তুমি খালিদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নাও, তাহলে খালিদের সাথে আমিও মদীনায় চলে গেলে তোমার অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।"

॥ বিরাশি ॥

পরদিনই মক্কার সকলের মুখে ছিল—"খালিদ বিন ওলীদ মুহাম্মাদের কাছে চলে গেছে।"

হযরত খালিদ (রা.) স্মৃতির ফিতায় ঘুরে ঘুরে মদীনা পানে এগিয়ে চলছেন। অতীতের মাঝে তিনি এমনভাবে হারিয়ে যান, যেন তিনি ঘোড়ায় চড়ে মদীনা নয়; বরং পায়ে হেঁটে ঘটনাবহুল অতীতে বিচরণ করছেন। তিনি এভাবে ভাব-বিহ্বলতায় চলতে চলতে মদীনার এতকাছে পৌঁছে যান যে, উঁচু উঁচু ভবনের মস্তকগুলো তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে।

"খালিদ!" কেউ তাঁর নাম ধরে ডাক দেয়। কিন্তু তিনি এটাকে অতীতের খেয়ালী আওয়াজ মনে করে পাত্তা দেন না।

একটু পর অশ্বের খুরধ্বনি ভেসে আসলে তিনি মাথা তুলে তাকান। তাঁকে লক্ষ্য করে দু'টি ঘোড়া একযোগে ছুটে আসতে দেখেন। তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। ঘোড়া তাঁর নিকটে এসে থেমে যায়। এক অশ্বারোহী ছিল তাঁরই গোত্রের প্রখ্যাত যোদ্ধা আমর ইবনুল আস। আর দ্বিতীয় ঘোড়ায় চেপে ছিল উসমান বিন তলহা। তারাও তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছিল না।

"তোমরা দু'জন আমাকে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসেছ?" হযরত খালিদ (রা.) তাদের লক্ষ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে মারেন।

"তার আগে বল তুমি কোথায় যাচ্ছ?" আমর ইবনুল আস পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে বলে।

"তা তোমরা চলেছ কোথায়?" হযরত খালিদ (রা.) পুনরায় তাদের কোটে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন।

"খোদার কসম! আমাদের জবাব তোমাকে খুশী করবে না।" প্রশ্নের ধারাবাহিকতা বদল করে উসমান বিন তলহা বলে—"আমাদের গন্তব্য মদীনা।"

"কথা সম্পূর্ণ কর উসমান!" আমর ইবনুল আস স্পষ্টভাষায় তাদের উদ্দেশ্য জানিয়ে দিতে বলে—"খালিদ! আমরা মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছি। আমরা মুহাম্মাদকে আল্লাহ্‌র সত্য নবী বলে মেনে নিয়েছি।"

"তাহলে তো আমরা একই পথের পথিক।" হযরত খালিদ (রা.) উৎফুল্লতার সাথে বলেন—"এস, একত্রে চলি।"

৬২৮ খৃস্টাব্দের ৩১ মে। ইসলামী ইতিহাসের দুই মহান সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) এবং হযরত আমর ইবনুল আস এ দিনে মদীনায় প্রবেশ করেন। তাদের সাথে উসমান বিন তলহাও ছিল। তিনজনই রাসূল (সা.)-এর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হন। সর্বপ্রথম হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) অভ্যন্তরে যান। তার পিছু পিছু হযরত আমর ইবনুল আস এবং হযরত উসমান বিন তলহা যান। সবাই একযোগে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

রাসূল (সা.) উঠে দাঁড়ান এবং এক এক করে সবাইকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন।

॥ তেরাশি ॥

আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ হয়েছে, তাদেরকে অন্তর থেকে যতই বের করে দেয়া হোক, তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেয়া হোক, তাদের স্মৃতিকে শরাবে ডুবিয়ে দেয়া হোক, শহীদদের প্রাণ উৎসর্গের বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক যে ভূখণ্ড আমাদের দান করেছেন, তার বাদশাহ হয়ে মাথা উঁচু করে গর্ব করি এবং বলি যে, আমিই এ দেশের সম্রাট, শহীদদের নাম জগৎ হতে মুছে দিই, কোথাও কোন শহীদের কবর দেখলে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিই-তারপরেও জীবনের প্রতি পদে পদে, প্রত্যেকটি মোড়ে শহীদদের দাঁড়ানো দেখা যাবে। তারা মনের গহীন কোণ থেকে উঠে আসবে এবং মদ ও পদের নেশা ছুটিয়ে দেবে। যারা শহীদদের রক্ত ও লাশ মাড়িয়ে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করে শহীদদের সাথে বেঈমানী করে তারা আল্লাহ্‌র কাছে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। কারণ, তারা কুরআনের এই ঘোষণা বিরুদ্ধাচরণ করেছে—"শহীদরা জীবিত, তাদেরকে মৃত বল না।"

আরব ভূখণ্ডের উরদুন রাজ্যে 'মুতা' নামক একটি অপরিচিত স্থান ছিল। এ স্থান দিয়ে গমনাগমনকারীদেরও সম্ভবত জানা ছিল না যে, এখানে একটি

লোকালয় আছে। সব মিলিয়ে তাকে একটি ছোট গ্রাম বলা যেতে পারে ঊর্ধ্বে। কিন্তু সেখানকার শহীদরা উরদুনের বাদশাকে তাদের উপস্থিতি এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ জিন্দেগীর খবর জানিয়ে দেয়। সাড়ে তেরশ বছর পূর্বে সংঘটিত এক যুদ্ধে তারা এখানে শহীদ হয়েছিল। এরপর স্থানটি বহমান কালের উড়ন্ত বালুকণায় চাপা পড়ে যায়।

কিছুদিন যাবত মুতার অধিবাসীরা এক বিস্ময়কর অবস্থার সম্মুখীন হতে থাকে। আজও সেখানে গেলে এবং সেখানকার অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে যে, প্রত্যহ তাদের কেউ না কেউ রাতে এই স্বপ্ন দেখে যে, সাড়ে তেরশ বছর পূর্বের মুজাহিদ বাহিনী চলাফেরা করছে। কাফেরদের কোন বাহিনী এলে তারা দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করছে। মুজাহিদদের সংখ্যা খুবই কম। পক্ষান্তরে কাফের বাহিনী সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। বড় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়।

এই স্বপ্ন এক-দু'জন নয়; অত্র এলাকার অনেকেই দেখেছে। এখনও পর্যন্ত মানুষ এই স্বপ্ন দেখে। ঐ এলাকার লোক অধিকাংশই অশিক্ষিত। সাড়ে তেরশ বছর পূর্বে যে এখানে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় তা তাদের জানা ছিল না। তারপরেও তারা স্বপ্নে শহীদদের দেখতে থাকে। এ খবর বাতাসে ভেসে এক সময় উরদুনের শাহী প্রাসাদে পৌঁছে যায়। তখন তথ্যানুসন্ধান করে দেখা যায় যে, এটা ঐ 'মুতা' অঞ্চল যেখানে মুসলমান বনাম খৃস্টানদের মাঝে এক ঐতিহাসিক লড়াই সংঘটিত হয়েছিল। এই খৃস্টানরা ছিল তৎকালীন আরবের অধিবাসী।

শহীদগণ তাদের জীবিত থাকার এমন অনুভূতি সৃষ্টি করে দেয় যে, উরদুনের শাসক মুতা রণাঙ্গনে এবং এ যুদ্ধে শহীদগণের স্মৃতি হিসেবে একটি চমৎকার মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ জারী করেন। ১৯৬৮ খৃস্টাব্দে মসজিদের কাজ শুরু হয়। মুতা যুদ্ধে তিন সেনাপতি হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.), হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহা (রা.) একের পর এক শহীদ হয়েছিলেন। তিনও সেনাপতির কবর মুতা থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে অবস্থিত। আজও কবর তিনটি সুসংরক্ষিত।

মদীনায় এসে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এরই মধ্যে তিন মাস পার হয়ে যায়। তিনি বেশিরভাগ সময় রাসূল (সা.) সান্নিধ্যে থেকে বিভিন্ন দিক থেকে উপকৃত হতেন। এ সময়ের মাঝে কোন যুদ্ধের দামামা না বাজায় স্বীয় যুদ্ধ-নৈপুণ্য দেখানোর সুযোগ তাঁর হয় না। সমরশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ প্রজ্ঞা ও দক্ষতা ছিল। তাঁর আভিজাত্য এবং বংশ কৌলিন্যও সাধারণ আরবদের থেকে সম্ভ্রান্ত ও উন্নত

ছিল। তারপরেও তিনি কোনদিন সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হওয়ার দাবী করেননি। তিনি চিরদিন নিজেকে একজন সাধারণ সিপাহী হিসেবে মনে করেন এবং এতেই তুষ্ট থাকেন।

॥ চুরাশি ॥

আজকের সিরিয়া এর উরদুন এলাকায় তৎকালীন সময়ে গাসসান গোত্র বসবাস করত। দূর দূর এলাকায় তারা ছড়িয়ে ছিল। শক্তিধর হিসেবে এ গোত্রের প্রসিদ্ধি সর্বত্র ছিল। কারণ, তারা যেমন ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তেমনি সংখ্যার দিক দিয়েও ছিল অনেক। এই বিখ্যাত গোত্রে খৃষ্টানরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তখন রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস। যুদ্ধবাজ এবং যুদ্ধ-প্রলয় পটিয়সী হিসেবে তার খ্যাতি দিগন্তব্যাপী। ইসলাম দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করছিল। হাজার হাজার কুরাইশ তখন পর্যন্ত ইসলামের ছায়াতলে এসে গেছে। তাদের বিখ্যাত এবং নাম করা নেতা ও সেনাপতিরাও মদীনায় গিয়ে রাসূল (সা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছে। যার ফলে মুসলমানরা একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলে। ছোট ছোট কিছু গোত্র ইসলামের পূর্ণ অধীনে চলে আসে।

মদীনায় বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ পৌছতে থাকে যে, গাসসান গোত্র মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং ইসলামের ব্যাপকতা রুখতে মুসলমানদেরকে ময়দানে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করতে চায় এবং এ উদ্দেশে তারা ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নিতেও শুরু করেছে। এ খবরও প্রকাশ পায় যে, গাসসানের সর্বোচ্চ নেতা রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াসের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলে তার সমরশক্তিকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেষ্টা করছে। রাসূল (সা.) গাসসানের শীর্ষ নেতার উদ্দেশে এক রাষ্ট্রীয় দূতকে এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। ইসলামই একমাত্র ধর্ম এবং জীবন ব্যবস্থা। এর বাইরে যত ধ্যান-ধারণা মাজহাব রূপে লাভ করেছে তা ধারণাপ্রসূত এবং মানব রচিত। রাসূল (সা.) উক্ত বার্তায় গাসসানের শীর্ষ নেতার প্রতি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান।

রাসূল (সা.) বার্তাটি এই উদ্দেশে প্রেরণ করেন, যাতে গাসসান গোত্র রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সমর শক্তিতে প্রভাবিত হয়ে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত না হয়ে যায়; বরং তারা ইসলাম কবুল করুক। অতঃপর তাদেরকে নিজেদের সাথে একীভূত করে হিরাক্লিয়াসের খপ্পর থেকে রক্ষা করা হবে।

"খোদার কসম! এর থেকে উত্তম কোন সিদ্ধান্তই হতে পারে না।" হযরত খালিদ (রা.) এক বৈঠকে বলেন—"হিরাক্লিয়াস সৈন্য পাঠালে তার অর্থ হল—শক্তির এক তুফান আসছে, যা সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

রাসূল (সা.)-এর দাওয়াত কবুল করে নেয়ার মধ্যেই গাসসানের মঙ্গল।" আরেকজন মন্তব্য করে।

"রাসূল (সা.)-এর আহ্বানে সাড়া না দিলে চিরদিনের জন্য হিরাক্লিয়াসের গোলাম হয়ে যাবে।" আরেকজন এটা সংযোজন করে।

রাষ্ট্রীয় দূত পৌঁছার পূর্বেই হিরাক্লিয়াস গাসসানের এলাকায় এসে পড়ে। তার সাথে এক লাখ সৈন্য ছিল। গাসসানের শীর্ষ নেতা যথাসময়ে হিরাক্লিয়াসের আগমনের সংবাদ জানতে পারে। কিন্তু সে এতে উদ্বিগ্ন হয় না। কারণ, ইতিপূর্বেই সে হিরাক্লিয়াসের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

নবী করীম (সা.) কর্তৃক প্রেরিত রাষ্ট্রীয় দূত বসরায় চলছেন। কারণ, গাসসানের রাজধানী ছিল বসরা। দূতের সাথে এক উষ্ট্রী বোঝাই পথের খোরাকী ছাড়াও তিনজন প্রহরী ছিল।

দীর্ঘ সফরের পর দূত মুতায় পৌঁছেন। তিনি একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য ক্ষুদ্র কাফেলার যাত্রাবিরতি করেন। নিকটেই গাসসান গোত্রের একটি বসতি ছিল। বসতির সর্দারের কাছে খবর পৌঁছে যে, চার ভিনদেশী বসতির নিকটে বিশ্রাম নিচ্ছে। সর্দার শারাহবীল বিন আমর দূতকে তার কক্ষে তলব করে এবং তার পরিচয় ও গন্তব্য জানতে চায়।

"আমি মদীনার দূত; বসরা যাচ্ছি।" দূত জবাব দেন—"আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর বার্তা তোমাদের শীর্ষ নেতার উদ্দেশে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

"কুরাইশ গোত্রের মুহাম্মাদের কথা বলছ?" শারাহবীল তিরস্কারের সুরে বলে—"কি বার্তা নিয়ে যাচ্ছ?"

"বার্তার সারকথা হলো, ইসলাম কবুল কর।" দূত জানান—"এবং ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পরিহার কর।"

"আমাদের শীর্ষ নেতা এবং ধর্মের অবমাননা আমি সহ্য করব বলে মনে করছ?" শারাহবীল চড়া গলায় বলে—"বাঁচতে চাইলে এখান থেকেই মদীনা ফিরে যাও।"

"বসরার পথ পরিহার করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" দূত মদীনায় ফিরে যাবার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলেন—"এটা আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর

নির্দেশ। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে গর্বের সাথে নিজের জীবন উৎসর্গ করব।"

"আর আমি গর্বের সাথে তোমার জীবন হরণ করব।" শারাহবীল এ কথা বলে এবং তার লোকদের প্রতি হত্যাসূচক ইশারা করে।

দূতের অপর তিন সাথী কক্ষের বাইরে বসা ছিল। ভেতর থেকে তিন ব্যক্তি বের হয়। তারা কারো রক্তাক্ত লাশ টেনে-হিঁচড়ে বাইরে আনছিল। লাশের দেহ মস্তক বিচ্ছিন্ন থাকলেও দূতের সাথীত্রয়ের লাশ শনাক্ত করতে দেরী হয় না। লাশের পিছন পিছন শারাহবীলও বাইরে আসে।

"তোমরা তার সাথী ছিলে?" শারাহবীল তিন সাথীকে বলে—"আমার বিশ্বাস তাকে ছাড়া তোমরা বসরা যাবে না।"

"না।" এক সাথী জবাব দেয়—"বার্তা ছিল তার কাছে।"

"যাও, মদীনায় ফিরে যাও।" শারাহবীল বলে—"আর মুহাম্মাদকে বল—"আমরা গোত্র এবং আকীদা-বিশ্বাসের অবমাননা সহ্য করি না। লোকটি বসরা গেলে সেখানেও কতল হত।"

"খোদার কসম!" এক সাথী সাহস করে বলে—"আমরা মেহমানের সাথে এমন ব্যবহার করি না।"

"মেহমান মনে করার কারণেই আমি তোমাদের জীবন ভিক্ষা দিচ্ছি।" শারাহবীল বলে—"আশা করি লাশ ফেরৎ চেয়ে আমার কাছে আবেদন করবে না।"

॥ পঁচাশি ॥

মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই জানত যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দূত ইসলামের দাওয়াতী বার্তা নিয়ে বসরা গেছে। দূত কি জবাব নিয়ে ফেরে তা জানতে সবাই অপেক্ষমাণ ছিল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে দূত ছাড়াই অপর তিন সাথী ফিরে আসে। তাদের চেহারায় কেবল ধূলির আস্তরণ এবং ক্লান্তির ছাপই ছিল না, বেদনা এবং ক্রোধও ঠিকরে পড়ছিল। তারা মদীনায় পা দিলে জনতা তাদের ঘিরে ভীড় জমায়।

"খোদার কসম! আমরা প্রতিশোধ নিব।" তিন মুহাফিজ সাথী হাত নাড়িয়ে একথা বলতে বলতে চলছিল—"মুতার শারাহবীলকে হত্যা করা আমাদের জন্য অনিবার্য হয়ে গেছে।"

এ মর্মান্তিক খবর ছড়িয়ে পড়লে মদীনার সবাই এক স্থানে এসে সমবেত হয়। রাসূল (সা.)ও যথাসময়ে সংবাদ পান। দূত হত্যায় তিনি দারুণ মর্মাহত হন। আরবের রীতি, কতলের মোকাবেলায় কতল। সমবেত জনতা "প্রতিশোধ প্রতিশোধ" শ্লোগান দিচ্ছিল। বর্তমানের মত তখনকার যুগেও দূতিয়ালী প্রথা ছিল এবং শত্রুপক্ষের দূতকেও অপর পক্ষ সমীহ্ করত এবং তাকে নিরাপত্তা প্রদান করত। কারো দূত হত্যা করাকে যুদ্ধের ঘোষণা বলে মনে করা হত।

"প্রিয় মদিনাবাসী!" রাসূল (সা.) ভারাক্রান্ত জনতার উদ্দেশে অশ্রুসিক্ত বেদনাহত কণ্ঠে বলেন—"আমি গাসসানীদের প্রতি যুদ্ধের বার্তা প্রেরণ করেছিলাম না। আমার বার্তা ছিল শান্তির বার্তা। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলাম মাত্র। যদি তারা শান্তির বার্তা উপেক্ষা করে লড়াই করতে আগ্রহী হয় তবে আমরাও লড়তে পিছপা হব না।"

"আমরা লড়ব... প্রতিশোধ নেব...মুসলমানরা দুর্বল নয়।" জনতা শ্লোগান তোলে—"মুসলমানের রক্ত এত সস্তা নয়।...আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ইজ্জত রক্ষার্থে জীবন দিয়ে দিব।"

রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে এ দিনেই মুজাহিদ বাহিনী তৈরী হয়ে যায়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিন হাজার সাহাবী যুদ্ধে নাম লেখান। এ যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব রাসূল (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর স্কন্ধে অর্পণ করেন।

"যায়েদ শহীদ হলে সেনাপতি হবে জাফর বিন আবী তালেব।" নবী করীম (সা.) যাবার প্রাক্কালে বলে দেন—জাফরও শহীদ হলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহা হবে তার স্থলাভিষিক্ত। আব্দুল্লাহ্ যদি শহীদ হয়ে যায় তখন মুজাহিদরা তাদের মধ্য হতে একজনকে সেনাপতি নির্বাচন করে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে।"

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ লেখেন, রাসূল (সা.) পরপর তিন সেনাপতি নির্ধারণ করে মুজাহিদ বাহিনীকে দোয়ার মাধ্যমে বিদায় দেন। রাসূল (সা.) সেনাপতি হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে ডেকে বলেন, মুতা পৌছার পর প্রধান কাজ হল, আমাদের দূত হত্যাকারী শারাহবীলকে হত্যা করা। এরপরে মুতা ও তার আশেপাশের লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করবে। ইসলামের পরিচয় তাদের সামনে তুলে ধরবে। তারা ইসলাম কবুল করলে তাদের প্রতি হস্ত উত্তোলন করবে না।

এই মুজাহিদ বাহিনীতে হযরত খালিদ (রা.) একজন সাধারণ সৈন্য হিসেবে ছিলেন। কোন ইউনিট কিংবা ক্ষুদ্র দলেরও কমান্ডার ছিলেন না।

॥ ছিয়াশি ॥

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ফৌজ আজকের উরদুনের কোন এক স্থানে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিল। তারা যেখানে এসে সেনা ছাউনী ফেলে তা গাসসান গোত্রের এলাকা ছিল। ঐতিহাসিকদের ভাষ্যমতে রোম সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষ। বিশাল এ সেনাবাহিনী অত্র এলাকার বসতিগুলোতে ছেয়ে যায়। ক্ষেতের ফসল, তাদের ঘোড়া এবং উট খেয়ে সাবাড় করে। ঘরে ঘরে যে খাদ্য সম্ভার এবং খেজুর সংরক্ষিত ছিল সেনারা তা জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে যায়। যুবতী, রূপসী নারীদের ঠিকানা হয় কমান্ডারদের তাঁবু।

হিরাক্লিয়াসের তাঁবুটি ছিল চারদিকে কারুকার্যখচিত মোটা পর্দা এবং উপরে বিচিত্র নক্শাগাঁথা ত্রিপল দিয়ে ছাদ করা একটি মিনি মহল। ফ্লোর ছিল দামী কার্পেটে মোড়া। প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রেরও কমতি ছিল না। অধিকাংশ স্বর্ণ-রৌপ্যের এবং আকর্ষণীয়। গাসসান গোত্রের শীর্ষ নেতা হিরাক্লিয়াসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা। হিরাক্লিয়াসের সসৈন্যে আগমনের সংবাদ পেয়ে সে মূল্যবান উপঢৌকন এবং তারই গোত্রের বাছাই করা দশ-বারোজন সুন্দরী নারী সাথে নিয়ে হিরাক্লিয়াসকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিল। ঐ নারীদেরই দুই-তিনজন এখন হিরাক্লিয়াসের ডান-বামে বসা।

"...আর তুমি জানিয়েছ যে, মদীনার মুহাম্মাদ তোমার প্রতি এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করেছিল যে, যেন তোমার গোত্র তার ধর্ম গ্রহণ করে নেয়।" হিরাক্লিয়াস গাসসানের নেতাকে বলে।

"আমি এটাও জানিয়েছি যে, শারাহবীল নামক আমার এক আঞ্চলিক নেতা মদীনার দূতকে আমার পর্যন্ত পৌছতে দেয়নি।" শীর্ষ নেতা জানায়—"তাকে মুতায় হত্যা করে ফেলে।"

"মদীনাবাসীদের এমন শক্তি ও সাহস আছে যে তারা দূত হত্যার প্রতিশোধ নিতে আসবে?" হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করে।

"তাদের শক্তি কম কিন্তু সাহস বেশী।" শীর্ষ নেতা বলে—"তাদের উপর মুহাম্মাদের জাদু পড়েছে। প্রথমে প্রথমে তাদের সম্পর্কে আমার কাছে খবর পৌছলে আমি বিষয়টিকে পাত্তা দিইনি। কিন্তু ইতিমধ্যে তারা কয়েকটি ময়দানে লড়াই করেছে এবং প্রতিটি ময়দানে বিজয় লাভ করেছে। অথচ প্রতিটি যুদ্ধে প্রতিপক্ষের তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। শুনেছি, মুহাম্মাদ এবং তাঁর কমান্ডারদের যুদ্ধ-কৌশলের সামনে কেউ টিকতে পারে না। আমার প্রতি তার

ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পত্র প্রেরণ থেকে অনুমিত হয় যে, সে নিজেকে বড় শক্তিধর মনে করছে।"

"এখন তোমার অভিপ্রায় কি?" হিরাক্লিয়াস বিবস্ত্রপ্রায় এক তরুণীর হাত থেকে শরাবের পেয়ালা নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করে।

"কথা খুলে বললে তাতে আমারও ফায়দা এবং আপনারও ফায়দা।" শীর্ষ নেতা বলে—"আপনার সৈন্য আমি দেখেছি। আমার গোত্র কোন ছোট গোত্র নয়। বেশী না হলেও আপনার মত সৈন্য আমারও আছে। আপনি স্বদেশ থেকে দূরে। যুদ্ধ বাঁধলে আমরা নিজ ভূমিতে লড়ব। তখন এখানকার প্রতিটি শিশু পর্যন্ত আপনার শত্রুতে পরিণত হবে।"

"তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছ?" হিরাক্লিয়াস-মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করে।

"যদি বাস্তবেই এটা ধমক হয় তবে তা আমি নিজেকেও দিচ্ছি।" গাসসানের শীর্ষ নেতা জানায়—"আমি আপনাকে পারস্পরিক যুদ্ধের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র। আর তা যে আমাদের কারো জন্য মঙ্গলজনক হবে না তা আপনার ভালো করেই জানা আছে। তবে আমাদের যুদ্ধ থেকে মদীনাবাসীরা অবশ্যই ফায়দা লুটবে। নিজেদের রক্তক্ষয় না করে আসুন, আমরা উভয়ে মিলে মুসলমানদের বিনাশ করি। বিজয় আমাদের করতলগত হলে প্রতিদানে আমি কিছুই চাইব না। বিজিত এলাকা আপনারই হবে। নিজ ভূখণ্ডে আমি ফিরে আসব।... নিজেরা যুদ্ধে জড়িয়ে শক্তি নষ্ট না করি। প্রথমে এমন এক শক্তিকে খতম করি, যা মদীনা হতে আমাদের বিরুদ্ধে তৈরী হচ্ছে।"

"আমি তোমার প্রস্তাব সমর্থন করছি।" সম্রাট হিরাক্লিয়াস বলে।

"তাহলে আপনার বাহিনীকে নিষেধ করুন—যেন তারা গাসসানী কোন বসতিতে লুণ্ঠন না চালায়।" শীর্ষ নেতা অনুরোধ করে।

"হ্যাঁ, নিষেধ করব।" হিরাক্লিয়াস বলে—"মদীনাবাসীদের এখানে আসার অপেক্ষায় আমাদের বসে থাকলে চলবে না। আমরাই মদীনা পানে এগিয়ে যাব।"

॥ সাতাশি ॥

তাদের বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয় না। ইতিমধ্যেই মদীনার তিন হাজার মুজাহিদ মুতার লক্ষ্যে মদীনা হতে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। মুতার অনতিদূরে 'মাআন' নামক স্থানে মুজাহিদ বাহিনী যাত্রাবিরতি করে। এই এলাকা এবং

সামনের এলাকা মুজাহিদদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। সামনের কোন সংবাদও তাদের জানা ছিল না। তাদের জন্যে এটুকু সংবাদ অতীব জরুরী ছিল যে, সামনে শত্রুসৈন্য আছে কি-না। থাকলে তাদের সংখ্যা কত এবং তারা কোন পজিশনে আছে। এই তথ্যটুকু সংগ্রহ করতে তিন-চারজন মুজাহিদকে দরিদ্র উষ্ট্রচালকের বেশে সম্মুখে প্রেরণ করা হয়।

এই গোয়েন্দা টিম রাত সামনে কোথাও অতিবাহিত করে পরের দিন বিকেল নাগাদ ফিরে আসে। তাদের সংগৃহীত তথ্য মুজাহিদদের জন্য সুখকর ছিল না। তারা চলতে চলতে অনেক দূরে গিয়েছিল। দু'টি গাসসানী পরিবার সর্বপ্রথম তাদের নজরে পড়ে। তারা পূর্বের আবাস ছেড়ে নতুন আবাসের উদ্দেশে কোথাও যাচ্ছিল। উভয় পরিবারের অধিকাংশ সদস্য ছিল তরুণী এবং যুবতী নারী। তাদেরকে বেশ ধনী এবং প্রভাবশালী মনে হয়। তাদের পারিবারিক জিনিস-পত্র কয়েক উটে বোঝাই ছিল। কাফেলা বিশ্রাম নিতে এক স্থানে অবস্থান করছিল।

মুসলিম গোয়েন্দা দলটিও সেখানে যাত্রাবিরতি করে। তারা অল্প সময়ের মধ্যে গাসসানী কাফেলার সাথে ভাব জমিয়ে ফেলে। কিন্তু তাদের মুসলিম পরিচয় ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পেতে দেয় না। নিজেদের গন্তব্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, তারা বসরা যাচ্ছে। সেখান থেকে বাণিজ্য পণ্য আনবে।

"সামনে যেয়ো না; এখান থেকেই ফিরে যাও।" কাফেলার লোকেরা গোয়েন্দাদের সতর্ক করে বলে—"রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াসের সৈন্যরা লুটপাট এবং হত্যাযজ্ঞ চালাতে চালাতে আসছে। তোমাদের ধন-সম্পদ এবং উট তারা দেখলে ছিনিয়ে নেবে। হত্যা করে ফেলারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।"

দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকে হিরাক্লিয়াসের সসৈন্যে আগমন সংক্রান্ত আলোচনা। গোয়েন্দারা কৌশলে জেনে নেয় যে, রোমীয় সৈন্যের ভয়ে ভীত হলেও তারা নিজ চোখে তাদের দেখেনি। কেবল লোকমুখে শুনেছে যে, সৈন্য উরদুনে ঢুকে লুটতরাজ চালাচ্ছে। যেহেতু তাদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা বেশী তাই তাদের রক্ষা করতে তারা অন্যত্র পালিয়ে যাচ্ছে।

হিরাক্লিয়াস সম্পর্কে সঠিক সংবাদ এবং বিস্তারিত তথ্য জানা গোয়েন্দা দলটির জন্য অপরিহার্য ছিল। কাজটি যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদজনক। তথাপি তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আরো সামনে এগিয়ে যায়। গাসসানের একটি বসতির কাছে এসে পৌঁছে। বসতিতে প্রবেশ করে এবং এই বলে নিজেদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে যে, আমরা বসরায় যাচ্ছিলাম কিন্তু পথিমধ্যে লুটেরা আমাদের সর্বস্ব

লুট করে নিয়ে গেছে। এলাকার লোকজন তাদের বিপদগ্রস্ত দেখে পানাহার করায় এবং যথেষ্ট আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করে। গোয়েন্দারা এদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য লাভ করে।

বাস্তব অবস্থা এই ছিল যে, হিরাক্লিয়াস এবং গাসসান গোত্রের মাঝে মৈত্রীচুক্তি স্থাপিত হয়েছে। গাসসানীরা নিজেদের সৈন্য হিরাক্লিয়াসের সৈন্যের মাঝে একীভূত করে দেয়। সম্মিলিত সেনাবাহিনীর বর্তমান লক্ষ্য মদীনা। ঐতিহাসিকগণ হিরাক্লিয়াসের সৈন্যসংখ্যা এক লাখ আর গাসসানী সৈন্য সংখ্যাও এক লাখ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, প্রত্যেকের এক লাখ করে নয়; বরং সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল এক লাখ। প্রতিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যার ব্যাপারে সবাই একমত যে, তারা তিন হাজার ছিল মাত্র।

এ গোয়েন্দা রিপোর্ট মুসলিম সেনানায়কদের গভীর চিন্তায় নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতির দাবী ছিল প্রতিপক্ষের বিশাল রণপ্রস্তুতি বনাম নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা বিবেচনা করে প্রত্যাবর্তন করা। কিন্তু তারা ফিরে যাবার কথা মনেও আনে না। অবশ্য 'মাআন' থেকে সামনে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা স্থগিত রাখে।

আমরা ফিরে যাওয়ার অর্থ হিরাক্লিয়াস এবং গাসসানকে বিনা বাধায় হুড়হুড় করে মদীনা পর্যন্ত যাবার দাওয়াত প্রদান করা।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহা (রা.) বলেন—"আমরা এখানেই শত্রুদের গতিরোধ করব।"

"মুষ্টিমেয় এ সৈন্য নিয়ে আমাদের পক্ষে বিশাল বাহিনীর গতিরোধ করা কি সম্ভব?" হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) জানতে চান।

"কোন্ রণাঙ্গনে আমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলাম না?" হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব হুংকার দিয়ে বলেন—আমরা পরামর্শ করে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে কেউ মদীনায় যাক এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে পরবর্তী নির্দেশ জেনে আসুক।"

"আমরা এতটা সময় অপচয় করতে পারি না।" হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন—"দুশমনও আমাদের এই সুযোগ দিবে না। খোদার কসম! আমি কিছুতেই এটা জানতে দিব না যে, আমরা প্রতিপক্ষের সৈন্য দেখে ভীত।"

"আর আমি এটা বলার জন্য মদীনায় প্রবেশ করব না যে, আমরা পিছু হটে এসেছি।" হযরত যায়েদ (রা.) বলেন—"আমরা জীবন উৎসর্গ করে জীবিতদের জন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে যাব। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, গাসসানী সেনাদের মাঝে খৃস্টানদের সংখ্যা বেশী। তারা তাদের ধর্মের খাতিরে লড়বে।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওহা (রা.) বৈঠক থেকে উঠে মুজাহিদদেরকে একস্থলে সমবেত করে এমন জ্বালাময়ী ভাষণ দেন যে, তিন হাজার মুজাহিদের নারাধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সেনাপতি হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) সামনে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, তিন হাজার মুজাহিদ এক লাখ সৈন্যের মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা নিজেদেরকে এক বিরাট পরীক্ষার মুখে নিক্ষেপ করেন। ইতিমধ্যে হিরাক্লিয়াস এবং গাসসানের শীর্ষ নেতাও সংবাদ পেয়ে যায় যে, দূত হত্যার প্রতিশোধ নিতে মদীনা হতে মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য আসছে। মুজাহিদদের পদতলে পিষ্ট করতে হিরাক্লিয়াস এবং গাসসানের সম্মিলিত বাহিনীও যাত্রা শুরু করে।

॥ আটাশি ॥

মুজাহিদ বাহিনী এগুতে এগুতে 'বালকা' গিয়ে পৌছে। আরো আগে যাবার পরিকল্পনা তাদের ছিল। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী হতে তিন গুণ বেশী সৈন্য সমৃদ্ধ দুই প্লাটুন গাসসানী ফৌজ পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) মুজাহিদ বাহিনীকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করান। তিনি একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে এলাকাটির জরীপ নেন। এলাকাটি যুদ্ধের উপযোগী বলে তাঁর কাছে মনে হয় না। পরবর্তী অন্যান্য সেনাপতিদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে পিছে সরিয়ে আনেন। গাসসানী ফৌজ এটাকে 'পিছুটান' মনে করে মুজাহিদদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

হযরত যায়েদ (রা.) সৈন্য পিছু সরিয়ে এনে মুতায় সবাইকে সমবেত করেন। দ্রুত বাহিনীকে যুদ্ধের কাতারে বিন্যস্ত করেন। তিনি মোট সৈন্যদেরকে তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত করেন। ডান, বাম এবং মধ্যবাহিনী। ডান পার্শ্ব বাহিনীর নেতৃত্বে থাকেন হযরত কুতবা ইবনে কাতাদা (রা.)। বাম পার্শ্ব বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত হন হযরত উবায়া বিন মালেক (রা.)। আর মধ্যবাহিনীর কমান্ড থাকে স্বয়ং সেনাপতি হযরত যায়েদ (রা.)-এর হাতে।

"আল্লাহ্ তা'আলার সত্য নবীর প্রেমিকগণ!" হযরত যায়েদ (রা.) উচ্চ কণ্ঠে কাতারবদ্ধ মুজাহিদদের উদ্দেশে বলেন—"আজ আমাদের প্রমাণ দিতে হবে যে, জগতে একমাত্র আমরাই সত্যের পূজারী। বাতিলের হাত থেকে আজ আল্লাহ্র জমিন ছিনিয়ে নিতে হবে। বাতিলের সৈন্য দেখে আতঙ্কিত হবে না।... মনে রেখ, এটা পেশী শক্তির লড়াই নয়। এটা সাহস, দৃঢ় মনোবল এবং বুদ্ধির লড়াই। আমি তোমাদের সেনাপতি এবং পতাকাবাহীও। শত্রুর সৈন্য এত বেশী

যে, তোমরা তাদের মাঝে হারিয়ে যাবে। কিন্তু খবরদার! দেহ হারিয়ে গেলেও বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা হারিয়ে যেতে দিবে না। আমরা এক সাথে লড়ে এক সাথেই মরব।"

একথা বলেই তিনি ইসলামের পতাকা হাতে তুলে নেন।

শত্রুপক্ষ হতে তীরের প্রথম ঝাঁক উড়ে আসে। হযরত যায়েদ (রা.)-এর নির্দেশে ডান এবং বাম পার্শ্বস্থ বাহিনী প্রসারিত হয়ে সামনে এগিয়ে যায়। এটা ছিল সরাসরি সংঘর্ষ। সম্মুখ যুদ্ধ। মুজাহিদগণ ডানে-বামে আরো প্রসারিত হয়ে এগিয়ে যায়। যখন উভয় পার্শ্ববাহিনী অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায় ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত যায়েদ (রা.) মধ্য বাহিনীকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি ছিলেন সবার আগে আগে। যুদ্ধে সাধারণত সেনাপতি মধ্যম ভাগে থেকে সৈন্য পরিচালনা করে। কিন্তু মুজাহিদদের সাহস বৃদ্ধি ও প্রেরণা উজ্জীবিত রাখতে এ যুদ্ধে সেনাপতির জন্য সামনে থাকা জরুরী ছিল।

সেনাপতি হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর হাতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন থাকায় শত্রুপক্ষ তাঁর উপর জোরদার আক্রমণ চালাতে থাকে। বাতাসের গতিতে তাঁর লক্ষ্যে তীরের ঝাঁক ছুটে আসতে থাকে। ইতিমধ্যে কয়েকটি তীর তাঁর দেহ ঝাঁঝরা করে দেয়। আহত স্থান থেকে রক্ত বেয়ে গড়িয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও তিনি পতাকা নিচু হতে দেন না। মুখের তর্জন-গর্জন থামে না। এক হাতে পতাকা ধরে অপর হাতে সপাটে তলোয়ার চালাতে থাকেন। এক সময় বর্শা এসে তাঁর দেহে বিদ্ধ হয়। আর সোজা হয়ে বসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হতে জমিনে লুটিয়ে পড়েন এবং শহীদ হয়ে যান। হযরত যায়েদ (রা.)-এর হাত হতে পতাকা পড়ে গেলে মুজাহিদরা কিছুটা হতাশ ও সন্ত্রস্ত হয়। কিন্তু হযরত জাফর বিন আবী তালেব (রা.) ঝড়ের বেগে এসে পতাকা হাতে তুলে নেন।

"আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর প্রেমিকবর!" হযরত জাফর (রা.) ঝাণ্ডা উড্ডীন করে জোরালো কণ্ঠে বলেন—"আল্লাহ্‌র শপথ! ইসলামের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হতে পারে না।"

এরপর তিনি হযরত যায়েদ (রা.)-এর দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। নয়া সেনাপতি হযরত জাফর (রা.)-এর জ্বালাময়ী ভাষণে সৈন্যদের সাময়িক জড়তা ও হীনতা মুহূর্তে দূর হয়ে সেখানে দৃপ্ত প্রত্যয় স্থান করে নেয়। তাদের বিধ্বস্ত মনোবল শত্রু-বিধ্বংসী শক্তিতে রূপ নেয়। বিশাল শত্রুবাহিনীর মাঝে মুজাহিদ বাহিনী হারিয়ে গেলেও তাদের মনোবল ছিল তুঙ্গে। শক্তি ছিল অটুট। নতুন

উদ্যোমে তারা লড়তে থাকে। ক্ষুধার্ত শার্দুলের ন্যায় প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্ষণে ক্ষণে নারাধ্বনির রব রণাঙ্গন কাঁপিয়ে তুলতে থাকে। দুশমনের কানে এ রব ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি হয়ে আঘাত হানে। থরথর করে কেঁপে ওঠে তাদের দেশ। বাহুবল শ্লথ হয়ে যায়। এক অজানা আতঙ্ক আর অদৃশ্য ভীতি তাদের গ্রাস করে ফেলে। নাটকীয়ভাবে যুদ্ধে ছন্দপতন ঘটে। এর বিপরীতে মুজাহিদ বাহিনী বীর-বিক্রমে লড়ে চলে। তাদের সেনাপতিও সাধারণ সৈনিকের মত লড়তে থাকে। দীর্ঘক্ষণ তাদের পতাকা সমুন্নত ছিল।

কিছুক্ষণ পর পতাকায় পতনের আলামত দেখা যায়। একবার উঁচু হয়, একবার নিচু হয়। পরবর্তী সেনাপতি হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওহা (রা.) দূর থেকে পতাকার উত্থান-পতন দেখতে পান। পতাকার এ আচরণে তিনি বুঝতে পারেন পতাকাধারী আহত। তিনি পতাকা ঠিকমত সামলাতে পারছেন না। পতাকাবাহী সেনাপতি হযরত জাফর (রা.) নিজেই ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) আহত সেনাপতির উদ্দেশে ছুটে আসেন। কিন্তু চারপাশে এমন ভয়াবহ সংঘর্ষ চলছিল যে, সেখানে দ্রুত পৌছার কোন সুযোগ ছিল না।

প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পর হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওহা (রা.) সেনাপতির কাছ পর্যন্ত যেতে সক্ষম হন। তিনি পৌছতেই হযরত জাফর (রা.) পড়ে যান। তার পুরো শরীর ছিল রক্তস্নাত। শরীরে এমন কোন স্থান ছিল না, যেখানে তীর, বর্শা বা তরবারীর আঘাতে জর্জরিত ছিল না। ক্ষত-বিক্ষত এবং শত ঝাঁঝরার দেহ নিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত সোজা হয়ে বসে থাকা হযরত জাফর (রা.)-এর জন্য এক অলৌকিক ব্যাপার ছিল। হয়ত পরবর্তী সেনাপতি হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওহা (রা.)-এর অপেক্ষায় তার রূহ এতক্ষণ পতাকা ধারণ এবং যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। হযরত জাফর (রা.) পড়েই শহীদ হয়ে যান। এদিকে হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) সঠিক সময়ে পতাকার কাছে পৌছে যাওয়ায় পতাকা হযরত জাফর (রা.)-এর হস্তচ্যুত হলেও ভূলুণ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায় না। তিনি পতনোন্মুখ পতাকা ক্ষিপ্রগতিতে লুফে নিয়ে উঁচু করে তুলে ধরেন। নারাধ্বনি দিয়ে মুজাহিদদের জানিয়ে দেন যে, পতাকা এবং কমান্ডের দায়িত্ব এখন তাঁর হাতে।

শত্রু বাহিনীর এ দলটি ছিল মূল বাহিনীর একাংশ মাত্র। সংখ্যায় তারা ছিল দশ হাজার থেকে পনের হাজার। এদের সবাই গাসসানী খৃস্টান। তারা এই যুদ্ধকে ক্রুসেড ধর্মযুদ্ধ মনে করে বীরবিক্রমে লড়ছিল। বিশাল এই সৈন্যের বিপরীতে তিন হাজার মুজাহিদ আর কিইবা করতে পারে। কিন্তু তাদের নেতৃত্ব এত বিচক্ষণ এবং সমর দৃষ্টিকোণ থেকে এত সঠিক ছিল যে, মুজাহিদ বাহিনী

অপূর্ব রণকৌশল এবং কৃতিত্বের সাথে টেক্কা মেরে লড়ছিল। তাদের যুদ্ধের ধরন ভাড়াটে লেঠেল বাহিনীর মত ছিল না। কিন্তু তার পরেও শত্রুসংখ্যা কয়েকগুণ বেশী থাকায় মুজাহিদ বাহিনীর দুর্ভেদ্য সেনাপ্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি হতে থাকে। তাদের মাঝে বিক্ষিপ্ততা পরিলক্ষিত হয়। মুজাহিদদের টলটলায়মান এবং শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে কতক সৈন্য ঘাবড়ে রণাঙ্গন ছেড়ে আসে। কিন্তু তারা বেশী দূর যায় না; নিকটেই অবস্থান করতে থাকে। অবশিষ্ট মুজাহিদ বাহিনী চারজন, পাঁচজন মিলে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে বিক্ষিপ্ততার শিকার হওয়া থেকে বেঁচে যায়।

সমর বিশেষজ্ঞগণ লেখেন, গাসসানীরা মুসলমানদের এই বিশৃঙ্খলা এবং এলোপাথাড়ি অবস্থা থেকে কোন সুযোগ নিতে পারে না। আর তার কারণ এই ছিল যে, মুসলমানগণ এমন বীর-বিক্রম এবং এমন অপূর্ব রণদক্ষতার সাথে লড়াই করে যে, ইতিমধ্যে গাসসানীদের মাঝে মুসলমানদের সম্পর্কে এক অজানা ভীতি সঞ্চারিত হয়েছিল। তারা মুসলমানদের এই বিক্ষিপ্ততাকেও এক ধরনের জঙ্গী কৌশল হিসেবে মনে করে। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, মুসলিম সেনাপতি এবং কমান্ডারগণ উদ্ভূত পরিস্থিতি এভাবে সামাল দেন যে, পুরো বাহিনীকে আবার ঢেলে সাজাতে যারা তখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল তাদেরকে কৌশলে রণাঙ্গনের বাইরে নিয়ে আসেন।

এ সময় ইসলামী পতাকা আরেকবার ভূপাতিত হয়। এর অর্থ, তৃতীয় সেনাপতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহাও (রা.) শহীদ হয়ে গেছেন। এ পর্যায়ে মুসলমানদের অবস্থা আরো করুণ হয়ে দাঁড়ায়। সেনাপতিশূন্য অবস্থায় তাদের দুর্গতি চরমে পৌঁছে। তৃতীয়বার পতাকার পতন কোন ভাল লক্ষণ ছিল না; বরং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা অশুভ ইঙ্গিতবাহীই ছিল। রাসূল (সা.) নিজেই এই তিনজনকে সেনাপতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এখন সেনাপতি নির্বাচন করা মুজাহিদদের নিজেদের দায়িত্ব হয়ে পড়ে।

সেনাপতির অভাবে পতাকা ভূলুণ্ঠিতই ছিল। আর পতাকার পতন মানে পরাজয় বরণ করা। নেতৃস্থানীয় এক মুজাহিদ হযরত সাবেত বিন আরকাম (রা.) পতাকা উঁচু করেন এবং শ্লোগানের ভঙ্গিতে বলেন—"শীঘ্র কাউকে সেনাপতি নির্বাচন কর। ততক্ষণ আমি পতাকা উড্ডীন রাখছি।...আমি সাবেত বিন আরকাম বলছি।"

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ লেখেন, হযরত সাবেত (রা.) নিজেকে সেনাপতির যোগ্য বলে মনে করতেন না এবং তিনি মুজাহিদদের মতামত ছাড়া সেনাপতি

হতেও ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ, রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ ছিল, তিন সেনাপতি শহীদ হলে চতুর্থ সেনাপতি মুজাহিদরাই নির্বাচিত করবে। হযরত সাবেত (রা.)-এর দৃষ্টি হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর উপর পতিত হয়। তিনি নিকটেই ছিলেন। কিন্তু হযরত খালিদের ইসলামের বয়স মাত্র তিন মাস হওয়ায় মুসলমানদের মাঝে তাঁর কোন ব্যক্তিত্ব তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। এতদসত্ত্বেও হযরত সাবেত (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর রণ-অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধ-যোগ্যতা সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকায় তিনি হযরত খালিদ (রা.)-এর দিকে পতাকা বাড়িয়ে দেন।

"নিঃসন্দেহে এই পদের যোগ্য তুমি খালিদ!" হযরত সাবেত (রা.) বলেন।

"না।" হযরত খালিদ (রা.) অস্বীকার করে বলেন—"আমি এখনও এর যোগ্য হইনি।"

লড়াইয়ের তীব্রতায় কিছুটা ভাটা পড়ে। হযরত সাবেত (রা.) মুজাহিদদের আহ্বান করে বলেন, তোমরা খালিদকে পতাকা এবং সেনাপতিত্ব বরণ করে নিতে অনুরোধ কর। বেশিরভাগ মুজাহিদ হযরত খালিদ (রা.)-এর সমর যোগ্যতা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন এবং কুরাইশগোত্রে তাঁর যে বিরাট পদমর্যাদা ছিল তাও জানতেন।

"খালিদ...খালিদ...খালিদ!" চতুর্দিক হতে আওয়াজ উচ্চকিত হতে থাকে—"খালিদ আমাদের সেনাপতি।"

হযরত খালিদ (রা.) ক্ষিপ্তগতিতে পতাকা হযরত সাবেত (রা.)-এর হাত থেকে নিজের হাতে নেন।

গাসসানীরা লড়াই অব্যাহত রাখলেও একটু পিছে সরে গিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) জীবনের প্রথমবারের মত স্বাধীনভাবে যুদ্ধ নৈপুণ্য এবং নেতৃত্বের ঝলক প্রদর্শনের সুযোগ পান। তিনি কতক সৈন্যকে নিজের পাশে পাশে রাখেন এবং তাদের দ্বারা দূতের কাজ নিতে থাকেন। নিজেও ছুটোছুটি করেন এবং সমানে তলোয়ারও চালাতে থাকেন। এভাবে বহু প্রচেষ্টায় তিনি যুদ্ধ-সক্ষম মুজাহিদ বাহিনীকে এক জায়গায় জমা করে ঢেলে সাজান এবং তাদেরকে পিছনে সরিয়ে আনেন। গাসসানীরাও পিছে সরে যায়। তলোয়ারের ঝনাৎকার কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে শুরু হয় তীরযুদ্ধ। উভয় পক্ষ হতে তীরের বর্ষণ হতে থাকে। খোলা আকাশ দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর উড়ে যাচ্ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) পরিস্থিতির উপর নজর বুলান। মুজাহিদ বাহিনীও তাদের মনোবল দেখেন। এসব মিলিয়ে যে যোগফল বের হয় তাতে এ ছাড়া

কোন উপায় ছিল না যে, সামনে আর সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে এখানেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা। কারণ মুজাহিদ বাহিনীর সাহায্যের কোন অবকাশ না থাকলেও শত্রু বাহিনী প্রয়োজনীয় সাহায্য চাওয়ার আগেই লাভ করছিল। তদুপরি খাদ্যসঙ্কট কিংবা জনবলের কমতি তাদের ছিল না।

যুদ্ধ ক্ষান্ত করা বাস্তবতার দাবী হলেও হযরত খালিদ (রা.) যুদ্ধ ছেড়ে পিছু হটতে চাচ্ছিলেন না। কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিল, পিছু হঁটে গেলে শত্রুরা দুর্বলতা ভেবে পশ্চাদ্ধাবন করতে পারে। আর যদি বাস্তবেই তারা পশ্চাদ্ধাবন করে তখন এই মুষ্টিমেয় বাহিনীকে রক্ষা করা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখে পড়ে তিলে তিলে নিঃশেষ হবে।

হযরত খালিদ (রা.) অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এক দুঃসাহসিক এবং চ্যালেঞ্জিং সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর সর্বাগ্রে এসে দাঁড়ান এবং চোখের পলকে গাসসানীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুজাহিদ বাহিনী পতাকা এবং সেনাপতিকে সামনে দেখে তাদের শীতল রক্ত টগবগিয়ে উঠে। অবসন্ন বাহুতে শার্দুলের শক্তি ফিরে আসে। ভেঙ্গে পড়া মনোবল ইস্পাতসম দৃঢ় হয়ে যায়। হারানো শৌর্য-বীর্যে বলীয়ান হয়ে ওঠে। "হয় হরণ নয় মরণ' মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। সুযোগ্য সেনাপতির সুনিপুণ নেতৃত্বে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, ক্ষুধার্ত শার্দুলের ন্যায় মুজাহিদ বাহিনী একযোগে গাসসানী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের এই আক্রমণ এত দুঃসাহসিক ও ক্ষিপ্রগতির ছিল যে, সংখ্যাধিক্যতা সত্ত্বেও গাসসানীদের পা নড়বড় হয়ে যায়। মুসলমানদের নারাধ্বনি ও আক্রমণ বজ্রধ্বনি এবং আগুনের গোলা হয়ে তাদের উপর পড়তে থাকে। কোন কিছু বুঝার আগে এবং প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেয়ার মধ্যেই তারা মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞের শিকার হতে থাকে। তারা এক স্থানে দাঁড়িয়ে এ হত্যাযজ্ঞ চালায় না। স্থান পরিবর্তন করে করে গাসসানীদের কচুকাটা করতে থাকে। যেখানেই মুজাহিদ বাহিনী যায় সেখানেই লাশের স্তূপ এবং রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। মুসলমানরা ধূমকেতুর মত আভির্ভূত হয়ে চোখের পলকে কাজ শেষে হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। পিছনে রেখে যেত সারি সারি লাশ আর আহতদের বুকফাটা আর্তনাদ। ঐতিহাসিকগণ লেখেন এবং হাদীসেও আছে, হযরত খালিদ (রা.) সেদিন মুষ্টিমেয় মুজাহিদ নিয়ে গাসসানীদের উপর এমন তুফান সৃষ্টি করেন যে, আক্রমণের তীব্রতায় এক এক করে নয়টি তলোয়ার তাঁর হাতে খানখান হয়ে যায়।

হযরত খালিদ (রা.) দুঃসাহসিক এ আক্রমণ করলেও বেশীক্ষণ এখানে থাকা সমীচীন মনে করেননি। তিনি কৌশলে মুজাহিদদের পিছে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। তিনি এতেও সফল হন। তিনি মুজাহিদদের জিহাদী জোশ এবং ইসলামের টানে এ দুঃসাহসিক হামলা করেন। হামলার তীব্রতা এবং নারাধ্বনির কম্পনে গাসসানীরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা দিশেহারা হয়ে পিছে হঁটে যায়। হতাশাও তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। এ সময় মুজাহিদদের ডান বাহিনীর কমান্ডার হযরত কুতবা ইবনে কতাদা (রা.) গাসসানীদের মধ্যভাগে আচমকা ঢুকে তাদের সেনাপতি মালেককে হত্যা করে। সেনাপতির মৃত্যুতে গাসসানীদের অবশিষ্ট শক্তিও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ভয়-আতঙ্ক এবং উদ্বেগে সংখ্যায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও তারা অনেক পিছে হঁটে যায়। চেইন অব কমান্ড না থাকায় পুরো বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

এই দুঃসাহসিক আক্রমণের পশ্চাতে হযরত খালিদ (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল, প্রলয়ঙ্কারী তুফানের হাত থেকে মুষ্টিমেয় মুজাহিদ বাহিনীকে রক্ষা করা। তীব্র আক্রমণ করে গাসসানীদের পিছে হঁটিয়ে দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে নিরাপদে সরে পড়াই ছিল তার মূল পরিকল্পনা। তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ কাজটি সম্পন্ন করেন এবং শত্রুপক্ষ পিছু হঁটে যেতেই তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। এভাবে এ অসম যুদ্ধ জয়-পরাজয় ছাড়াই নিষ্পত্তি হয়।

এদিকে কোত্থেকে গুজব রটে যায় যে, মুজাহিদ বাহিনী পিছু হঁটে ফিরে আসছে। হযরত খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী মদীনা পৌঁছতেই লোকজন ‘পলায়নপর বাহিনী’ বলে তিরস্কার করতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) এসব পাত্তা না দিয়ে সোজা রাসূল (সা.)-এর সমীপে গিয়ে রণাঙ্গনের আদি-অন্ত তুলে ধরেন। এদিকে বাইরে ভর্ৎসনার আওয়াজ ক্রমে জোরাল হচ্ছিল।

“থামো!” রাসূল (সা.) জনতার উদ্দেশে নির্দেশ ছুঁড়ে বলেন—“এরা রণাঙ্গন হতে পালিয়ে আসা সৈন্য নয়। যুদ্ধ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও যুদ্ধ করতে থাকবে।...খালিদ আল্লাহ্‌র তরবারী-‘সাইফুল্লাহ্’।”

ইবনে হিশাম এবং ওকিদী লেখেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর পবিত্র মুখের এই বাক্যটি পরবর্তীতে হযরত খালিদ (রা.)-এর লকব বা উপাধিতে পরিণত হয়-“সাইফুল্লাহ”-আল্লাহ্‌র তরবারী। এরপর থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় এ তরবারী সর্বদা কোষমুক্তই থাকে।

॥ উননব্বই ॥

কুরাইশ শীর্ষ নেতা আবু সুফিয়ান এতদিন হুঙ্কার ছেড়ে কথা বললেও এবং মুসলমানদেরকে 'মুহাম্মাদী গ্রুপ' বলে পাত্তা না দিলেও এখন নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর আবু সুফিয়ান সেনাধ্যক্ষ থেকে শুধু গোত্রপ্রধানে পরিণত হয়েছিল। তাকে দেখলে মনে হত, যুদ্ধ-বিগ্রহের সাথে লোকটির আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। হযরত উসমান বিন তালহা (রা.) এবং হযরত আমর ইবনুল আসের (রা.) মত মহাবীররাও তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তার অধীনে এখন উল্লেখযোগ্য ছিল মাত্র দু'জন। ইকরামা এবং সফওয়ান। আবু সুফিয়ান স্পষ্ট অনুভব করে যে, তার অর্থাৎ কুরাইশী জঙ্গী শক্তি এখন অত্যন্ত দুর্বল।

"তুমি কাপুরুষ হয়ে গেছ আবু সুফিয়ান!" স্ত্রী হিন্দা একদিন তাকে বলে— "তুমি মদীনাবাসীদের এই সুযোগ এবং অবকাশ দিচ্ছ যে, তারা নিরাপদে সৈন্য সংগ্রহ ও সমবেত করবে এরপর হঠাৎ একদিন মক্কার উপর চড়াও হয়ে মক্কার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।"

"আমার সাথে আর আছেই বা কে হিন্দা?" আবু সুফিয়ান হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলে।

"নিজেকে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী পরিচয় দিতে শরম লাগে, যে নিজ আত্মীয়-স্বজন এবং নিজ গোত্রের নিহতদের খুনের বদলা নিতে ভয় পায়।" আবু সুফিয়ানের পৌরুষ লক্ষ্যে হিন্দার নারীসুলভ ককটেল নিক্ষেপ।

"আমি কতল করতে পারি।" আবু সুফিয়ান আহতস্বরে বলে—"আমি কতল হতে পারি। আমি কাপুরুষ নই। ভীত-সন্ত্রস্তও নই। আমি কোনমতেই স্বীয় অঙ্গীকার এড়িয়ে যেতে পারব না।... হুদায়বিয়ায় মুহাম্মাদের সাথে আমার কথা কি তুমি ভুলে গেছ?"...কুরাইশ এবং মুসলমানরা আগামী দশ বছর কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। যদি আমি চুক্তি লঙ্ঘন করে যুদ্ধে নামি আর মুসলমানরা জয়ী হয়...।"

"তুমি লড়াই করবে না।" হিন্দা বিকল্প পরিকল্পনা পেশ করে বলে— "কুরাইশরা লড়াই করবে না। আমরা নেপথ্যে থেকে অপর কোন গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ করতে পারি। আমাদের মূল টার্গেট মুসলমানদের ধ্বংস। চাই তা যেভাবেই হোক। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে আমরা গোপনে তাদের সহযোগিতা করতে পারি।"

"কুরাইশ ব্যতিরেকে আর কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ার দুঃসাহস রাখে?" আবু সুফিয়ান বলে—"মুতায় হিরাক্লিয়াস এবং গাসসানের লক্ষাধিক সৈন্য মুসলমানদের কোন ক্ষতি করতে পেরেছে? তুমি শোননি যে, লক্ষ্যাধিক সৈন্যের মোকাবেলায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার?...আমার গোত্রের কোন ব্যক্তিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী অপর কোন গোত্রের সহায়তা করার অনুমতি দিব না।"

"ভুলে যেয়ো না আবু সুফিয়ান!" হিন্দা রুদ্র কণ্ঠে বলে, "আমি সে নারী উহুদ রণাঙ্গনে যে হামযার পেট ফেঁড়ে কলিজা টেনে বের করেছিলাম এবং মুখে পুরে চিবিয়েছিলাম। তুমি আমার তপ্ত রক্ত কিভাবে শীতল করতে পার?"

"তুমি হামযার নয়; তার লাশের পেট ফেঁড়েছিলে।" আবু সুফিয়ান মুখে বিদ্রূপের হাসি টেনে বলে—"মুসলমানরা লাশ নয়। ...আর তারা যাই হোক না কেন আমি চুক্তি লঙ্ঘন করব না।

"চুক্তি তো আমিও ভঙ্গ করব না।" হিন্দা বলে—"কিন্তু মুসলমানদের থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ নেব। আর সে প্রতিশোধ হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। কুরাইশ গোত্রে এখনও বীর-বাহাদুর রয়েছে।"

"তা তুমি কি করতে চাও?" আবু সুফিয়ান আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে।

"শীঘ্রই তা তুমি জানতে পারবে।" হিন্দা উত্তর এড়িয়ে যায়।

॥ নব্বই ॥

মক্কার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খোজাআ এবং বনূ বকর নামে দু'টি গোত্র বসবাস করত। তাদের মাঝে পারস্পরিক বিবাদ ছিল অতি প্রাচীন। হুদায়বিয়ায় মুসলমান বনাম কুরাইশের মাঝে চুক্তি হলে এবং উভয় পক্ষ আগামী দশ বছর কোন প্রকার সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে এই উভয় গোত্র ঐ চুক্তির আওতায় এভাবে চলে আসে যে, খোজাআ গোত্র মুসলমানদের আর বনূ বকর গোত্র কুরাইশদের মিত্রত্ব বরণের ঘোষণা করে। হুদায়বিয়ার সন্ধি কুরাইশ আর মুসলমানদের মধ্যে হলেও খোজাআ এবং বনূ বকরের জন্য তা শান্তির মূর্তপ্রতীক হয়ে যায়। কারণ, এ সন্ধির ফলে এবং দুই গোত্র চুক্তিবদ্ধ দু'পক্ষের আওতাধীন হয়ে পড়ায় তাদের পারস্পরিক পুরাতন শত্রুতা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহও বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু ন্যায়-নীতি উপেক্ষা এবং সন্ধি ভঙ্গ করে বনূ বকর কোন ঘোষণা ছাড়াই হঠাৎ এক রাতে খোজাআ বসতির উপর চড়াও হয়। বনূ বকর কেন চুক্তিভঙ্গ করে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর কারো জানা ছিল না। তবে এক বর্ণনামতে

ইঙ্গিত মেলে যে, এর পেছনে হিন্দার হাত ছিল। হিন্দার পরিকল্পনা ছিল, খোজাআ যেহেতু মুসলমানদের মিত্র তাই বনূ বকর খোজাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করলে তারা মুসলমানদের সাহায্য চাইবে। মুসলমানরা অবশ্যই সাহায্য করতে আসবে। এদিকে কুরাইশরাও প্রস্তুত থাকবে। মুসলমানরা বনূ বকরের উপর আক্রমণ করতেই কুরাইশরা 'মিত্র রক্ষার' দোহাই দিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে অতীত পরাজয়ের মধুর প্রতিশোধ নিবে।

আরেক তথ্যমতে বনূ বকরের হামলা মূলত গাসসানী খৃস্টান ও ইহুদীদের চক্রান্তের ফসল ছিল। তারা এভাবে নীলনক্সা প্রণয়ন করে যে, যে কোন উপায়ে কুরাইশ এবং মুসলমানদের মিত্র গোত্রে লড়াই বাঁধিয়ে দিতে পারলে মিত্রতার খাতিরে মূল কুরাইশ এবং মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যাবে। বনু বকর খোজাআদের তুলনায় শক্তিশালী গোত্র ছিল। গাসসানী এবং ইহুদীরা বনু বকরের একটি মেয়েকে অপহরণ করে খোজাআ গোত্রের এক বসতির নিকট রেখে আসে। এদিকে বনু বকরের সর্দারের কাছে গিয়ে বলে, খোজাআরা তার গোত্রের একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে। বনু বকর গোপনে তদন্ত করে বাস্তবেই তাদের একটি মেয়েকে খোজাআর এক বস্তিতে পায়।

হিন্দা স্বামী আবু সুফিয়ানকে না জানিয়েই বনু বকরের সাহায্যে কুরাইশদের কয়েকজন লোক পাঠায়। এদের মধ্যে কুরাইশদের খ্যাতনামা সেনাপতি ইকরামা এবং সফওয়ানও ছিল। হামলা রাতের আঁধারে এবং অতর্কিতে হওয়ায় খোজাআর বিশজন মারা যায়। হিন্দা গোপনে কুরাইশদের লোক পাঠালেও এ তথ্য সর্বত্র ফাঁস হয়ে যায় যে, বনু বকরের হামলায় সহায়তা করতে কুরাইশদের লোক গিয়েছিল।

খোজাআ প্রতিরোধের কোন সুযোগই পায় না। বেঘোরে তাদের বিশজন প্রাণ হারায়। খোজাআ দলপতি এই নির্বিচার হামলার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সাহায্য প্রত্যাশায় দুই-তিনজন সাথী নিয়ে মদীনায় যায়। খোজাআ অমুসলিম গোত্র ছিল। খোজাআর এ প্রতিনিধিদল রাসূল (সা.)-এর সকাশে পৌছে জানায় যে, বনু বকর কুরাইশদের ছত্রচ্ছায়ায় আমাদের উপর আক্রমণ করে। কয়েকজন কুরাইশ যোদ্ধাও এই আক্রমণে স্বশরীরে অংশ নেয়। তারা আরও তথ্য প্রদান করে যে, ইকরামা এবং সফওয়ানও হামলায় শরীক ছিল। রাসূল (সা.) অতিশয় ক্রোধান্বিত হন। এটা সরাসরি চুক্তির লঙ্ঘন ছিল। রাসূল (সা.) তৎক্ষণাৎ মুজাহিদদের যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দেন।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, রাসূল (সা.)-এর প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত কঠোর। ঘটনাটি কেবল বনু বকর ও খোজাআর মধ্যে হলে হয়ত তিনি অন্য সিদ্ধান্ত নিতেন। কিন্তু বনু বকর হামলায় কুরাইশদের খ্যাতনামা সেনাপতি ইকরামা এবং সফওয়ান শামিল থাকায় রাসূল (সা.) বলেন, এ অপরাধবৃত্তি এবং সন্ধিভঙ্গের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব কুরাইশদের উপরই বর্তায়।

"আবু সুফিয়ান হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছে।" মদীনার অলি-গলি এবং ঘরে ঘরে এই আওয়াজ শুনা যায়—"রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে আমরা মক্কার এক একটি ইট খুলে ফেলব।...এবার কুরাইশদেরকে পায়ের উপর আছড়ে ফেলে তবেই আমরা ক্ষান্ত হব।"

রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি চলতে থাকে।

॥ একানব্বই ॥

আবু সুফিয়ান উড়ো খবর মারফৎ এতটুকুই শুধু জানতে পারে যে, বনু বকর খোজাআ গোত্রের উপর কারা যেন গেরিলা ধরনের হামলা চালিয়েছে এবং এতে খোজাআর কিছু লোক মারা গেছে। এ সংবাদ পাওয়ার পর তার মনে পড়ে যে, সে খুব ভোরে ইকরামা এবং সফওয়ানকে ঘোড়ায় চেপে কোথা হতে ফিরে আসতে দেখেছিল। সে তাদের কাছে জানতে চেয়েছিল যে, তারা এত ভোরে কোথা থেকে আসছে। কিন্তু তারা এই জবাব দিয়ে চলে যায় যে, আমরা মর্নিং ওয়ার্কে গিয়েছিলাম মাত্র। সকালের মুক্ত বাতাসে একটু বেড়িয়ে এলাম। আবু সুফিয়ান তাদের কথা বিশ্বাস করে নেয়। কিন্তু যখন দুপুর বেলা সে জানতে পারে যে, বনু বকর খোজাআর উপর আক্রমণ করেছে তখন আবু সুফিয়ানের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। সে তৎক্ষণাৎ ইকরামা এবং সফওয়ানকে ডেকে পাঠায়।

"খোজাআ গোত্রে বনু বকরের হামলায় তোমরা শরীক ছিলে না-এর স্বপক্ষে তোমরা প্রমাণ পেশ করতে পারবে?" আবু সুফিয়ান ক্ষিপ্ত কণ্ঠে তাদের কাছে জানতে চায়।

"তোমার কি মনে নেই যে, বনু বকর আমাদের মিত্র?" সফওয়ান বলে—"মিত্র সাহায্যের জন্য আহ্বান করলে তুমি পিঠ দেখাতে পারবে?"

"সবকিছু আমার মনে আছে।" আবু সুফিয়ান বলে—"খোদার কসম! তোমরা ভুলে বসেছ যে, কুরাইশ সর্দার কে?...আমিই তোমাদের সর্দার।...আমার অনুমতি ছাড়া তোমরা কারো সাহায্যে হস্ত প্রসারিত করতে পার না।"

"আবু সুফিয়ান!" ইকরামা বলে—"আমি তোমাকে গোত্রপতি বলে অবশ্যই স্বীকার করি। তোমার নেতৃত্বে অসংখ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তোমার প্রতিটি

নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। কিন্তু এখন দেখছি, তুমি গোত্রের মান-মর্যাদা দিন দিন বিকিয়ে দিচ্ছ। তোমার অন্তরে 'মদীনা-ভীতি' গভীরভাবে জেঁকে বসেছে।"

"আমি গোত্রের সর্দার হয়ে থাকলে যে অপরাধ তোমরা করেছ তা আমি ক্ষমা করব না।" আবু সুফিয়ান দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

"আবু সুফিয়ান!" ইকরামা পাল্টা বলে—"সে সময়ের কথা হয়ত তোমার মনে আছে, খালিদ মদীনায় চলে যাবার কালে তুমি তাকেও হুমকি দিয়েছিলে এবং আমি তোমাকে বলেছিলাম, প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। যার যাকে ভাল লাগে সে তার কাছে যেতে পারে। সেদিন আমি তোমাকে এ কথাও স্পষ্ট. জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তুমি পদক্ষেপ বদল না করলে আমিও সঙ্গ বর্জন এবং মুহাম্মাদের আনুগত্য গ্রহণ করতে বাধ্য হব।"

"তোমরা বোঝ না যে, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ কখনো সন্ধি ভঙ্গ করে না।" আবু সুফিয়ান বলে—"তোমরা বনু বকরের সাথে মিশে এবং মুসলমানদের মিত্র গোত্রের উপর আক্রমণ করে নিজ গোত্রের মুখে চুন-কালি মেখে দিয়েছ। যদি মনে করে থাক যে, মুহাম্মাদ প্রতিশোধ নিতে মক্কা আক্রমণ করলে তোমরা সে আক্রমণ প্রতিহত করবে,তবে নিশ্চিত যে তোমরা অলীক স্বপ্ন এবং অনর্থক আত্মতুষ্টিতে লিপ্ত। মদীনার সয়লাব ঠেকানোর সাধ্য তোমাদের নেই। কোন্ ময়দানে তোমরা মুসলমানদের ঠকিয়েছ? বিশাল সৈন্য নিয়ে তোমরা মদীনা অবরোধ করেছিলে না?"

"অবরোধ ছেড়ে পিছু হটার নির্দেশ তুমিই দিয়েছিলে।" সফওয়ান বলে— "তুমি আগে ভাগেই পরাজয় মেনে নিয়েছিলে।"

"আমি তোমাদের মত জেদী এবং অদূরদর্শী লোকদের কারণে পুরো গোত্রকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করবে না।" আবু সুফিয়ান বলে—"আমি মুসলমানদের সাথে এখনই প্রতারণা করতে পারি না। আমি মুহাম্মাদকে পুরো ঘটনা জানিয়ে স্পষ্ট বলব যে, আমাদের এক মিত্র গোত্র মুসলমানদের এক মিত্র গোত্রের উপর আক্রমণ করেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এবং আমার অজান্তে কুরাইশদের কতিপয় লোকও তাদের সাথে যোগ দেয়। এর অর্থ এই নয় যে, আমি সন্ধিভঙ্গ করেছি। আমি মুহাম্মাদকে জানাব যে, কতিপয় অদূরদর্শীর পদস্খলন সত্ত্বেও কুরাইশ গোত্র হুদায়বিয়া সন্ধির উপর অটল।"

আবু সুফিয়ান ইকরামা এবং সফওয়ানকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেই দ্রুত স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

॥ বিরানব্বই ॥

আবু সুফিয়ান ঐ দিনই মদীনার উদ্দেশে রওনা হয়। শত্রুর কাছে সে নিজে চলে যাওয়ায় মক্কার জনগণ ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে শ্লোগান উঠতে থাকে। তার স্ত্রী হিন্দা জনতার মাঝে ঘুরে ঘুরে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। আবু সুফিয়ানের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করে। জনগণকে আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে প্ররোচিত করে।

মদীনায় পৌঁছে আবু সুফিয়ান যে দরজায় নক করে তা ছিল তার কন্যা উম্মে হাবীবা (রা.)-এর গৃহ। দরজা খুলে যায়। পিতার দর্শনে কন্যার চেহারায় আনন্দের দ্যুতি খেলার পরিবর্তে সেখানে এসে জমা হয় রাজ্যের কালো মেঘ। কন্যা ইসলাম গ্রহণ করলেও এবং রাসূল (সা.)-এর সহধর্মিনীর মর্যাদায় উন্নীত হলেও পিতা তখনও ইসলামের শত্রু ছিল। শুধু শত্রু নয়; শত্রুপ্রধান। তাই পিতার আগমনে কন্যার খুশী হওয়ার কথা থাকলেও শত্রুপ্রধান এবং অমুসলিম বিবেচনায় খুশির মুহূর্তেও কন্যার মুখে হাসি ফোটে না। পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিতৃস্নেহে আপ্লুত হয় না।

"পিতা নিজ কন্যার গৃহে প্রবেশ করতে পারে না?" আবু সুফিয়ান কন্যার নির্লিপ্ততা দেখে জিজ্ঞাসা করে।

"পিতা যদি ঐ সত্যধর্ম গ্রহণ করে, যা তার কন্যা গ্রহণ করেছে তবে কন্যা পিতার পদতলে নিজের আঁখিযুগল বিছিয়ে দিতে প্রস্তুত।" উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন।

"কন্যা!" আবু সুফিয়ান বলে-"আমি বড় পেরেশান হয়ে এসেছি। আমি শান্তি ও বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে এসেছি।"

"কন্যা কি করতে পারে?" উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন—"আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে যান।"

কন্যার এই অসহযোগিতায় আবু সুফিয়ান হতাশ হয়ে সেখান থেকে চলে আসে। এবার সরাসরি রাসূল (সা.)-এর কাছে যাবে বলে মনস্থির করে। পথিমধ্যে পরিচিত অনেক মুখ তার সামনে ভাসে যারা কুরাইশী ছিল এবং ইতিপূর্বে তাকে নেতা বলে মানত। এককালের পরিচিত চোখগুলো এখন তার দিকে অপরিচিতের ভঙ্গিতে তাকায়। সবাই তাকে চুপে চুপে দেখতে থাকে। সে তাদের দুশমন ছিল। তার বিরুদ্ধে অনেক লড়াই করেছে। উহুদ যুদ্ধে এই আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা মুসলমানদের লাশের পেট ফাঁড়ে এবং তাদের নাক-কান কেটে তা দিয়ে হার বানিয়ে গলায় দিয়েছিল।

আবু সুফিয়ান মদীনাবাসীর উৎসুক দৃষ্টির মাঝ দিয়ে অতিক্রম করে এক সময় রাসূল (সা.)-এর কাছে গিয়ে পৌছে। সে হাত বাড়িয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসাফাহা করেন। কিন্তু রাসূল (সা.) অমনোযোগী ও উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। কারণ ইতিপূর্বেই রাসূল (সা.) জানতে পেরেছিলেন যে, বনু বকর কুরাইশদের ছত্রচ্ছায়ায় খোজাআর উপর আক্রমণ করেছে। রাসূল (সা.) কুরাইশদেরকে এখন প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করেন। রাসূল (সা.)-এর মতে এমন শত্রুর একমাত্র জবাব হলো—সৈন্য পাঠাও, যাতে তারা এটা মনে করার সুযোগ না পায় যে, আমরা দুর্বল।

"মুহাম্মাদ!" আবু সুফিয়ান বলে—"আমি এ ভুল ধারণা নিরসন করতে এসেছি যে, আমি হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করিনি। বনু বকরের সাহায্যে কতিপয় কুরাইশ আমার অনুমতি ছাড়া গেলে সেটা আমার অপরাধ নয়। আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিনি। তুমি চাইলে চুক্তি নবায়নের জন্য আমি প্রস্তুত।"

ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম এবং সমরবিদদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূল (সা.) আবু সুফিয়ানের প্রতি ফিরে তাকান না এবং তার সাথে কোন কথাও বলেন না।

রাসূল (সা.)-এর এ নীরবতা আবু সুফিয়ানের মধ্যে বিরাট আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সে ভয়ে সেখানে দীর্ঘক্ষণ বসার সাহস পায় না। নীরবে উঠে আসে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে গিয়ে দেখা করে।

"মুহাম্মাদ আমার কোন কথা শুনতে আগ্রহী নয়।" আবু সুফিয়ান আবু বকর (রা.)-কে গিয়ে বলে—"তোমরা তো আমাদেরই গোত্রের লোক আবু বকর! খোদার কসম! আমরা গৃহে আগত মেহমানের সাথে এমন আচরণ করি না যে, সে কি বলতে চায় তাও শুনি না। আমি বন্ধুত্বের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমি যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিহার করার চুক্তি করতে এসেছি।"

"আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তোমার কথার জবাব না দিয়ে থাকলে আমিও তোমার কথার কোন জবাব দিতে পারি না।" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন—"আমরা সেই মেহমানের কথা শুনি যে আমাদের কথা শোনে। আবু সুফিয়ান! মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে তুমি শোননি যে, তিনি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল! তুমি আল্লাহ্র রাসূলের এ আহ্বানও শোননি যে, আল্লাহ্ এক। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই?...শুনে থাকলে তুমি রাসূল (সা.)-এর দুশমন কেন হলে?"

"তুমি আমার কোন সাহায্য করবে না আবু বকর?" আবু সুফিয়ানের কণ্ঠে অনুনয় ঝরে পড়ে।

"না।" হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রত্যয়ী কণ্ঠ—"আমরা আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-এর নির্দেশের অনুগামী।"

আবু সুফিয়ান নিরাশ হয়ে মাথা নিচু করে চলে যায় এবং কারো থেকে হযরত উমর (রা.)-এর বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করে তাঁর সামনে গিয়ে বসে।

"ইসলামের শীর্ষ শত্রুকে মদীনায় দেখে আমি বিস্মিত।" হযরত উমর (রা.) আবু সুফিয়ানকে কোনকিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলেন—"আল্লাহ্র কসম! তুমি ইসলাম গ্রহণ করে আসনি।"

আবু সুফিয়ান হযরত উমর (রা.)-কে মদীনায় আগমনের উদ্দেশ্য খুলে বলে এবং তাঁকে এটাও জানায় যে, রাসূল (সা.) তার সাথে কথা পর্যন্ত বলেনি এবং হযরত আবু বকর (রা.)ও তাকে কোন প্রকার সাহায্য করেননি।

"আমার অধীনে পিঁপড়ার মত দুর্বল সৈন্যও যদি থাকে, তবুও আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" হযরত উমর (রা.) বলেন—"তুমি আমার নও; আমার রাসূল (সা.) এবং আমার ধর্মের শত্রু। আমার পদক্ষেপ তাই হবে যা আল্লাহ্র রাসূল (সা.) নেন।"

আবু সুফিয়ান হযরত ফাতেমা (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর সাথেও সাক্ষাৎ করে কিন্তু কেউ তার ফরিয়াদে কান দেননা। সে ব্যর্থ-হতাশ হয়ে মদীনা ত্যাগ করে। তার ঘোড়ার গতিতে এখন ঐ বেগ ছিলনা যা মদীনায় আসার সময় ছিল। ঘোড়ার মস্তকও ছিল অবনত। ঘোড়াসহ তার আরোহী এখন মক্কার যাত্রী।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু সুফিয়ান চলে গেলে অধিকহারে সৈন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। তিনি আরও বলেন, এত বিশাল পরিসরে যুদ্ধ প্রস্তুতি নাও, যেন কুরাইশরা চিরদিনের জন্য আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং মক্কাবাসী আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। তিনি আরো নির্দেশ দেন, সৈন্যরা অতি ক্ষিপ্রতার সাথে যাবে এবং সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে যাতে তাদের অগোচরেই তাদের ঘিরে ফেলা যায় অথবা মক্কার নিকটে এত দ্রুত পৌঁছতে হবে, যাতে কুরাইশরা সাহায্যের জন্য তাদের মিত্রগোত্রদের ডাকার সুযোগ না পায়।

॥ তেরানব্বই ॥

মদীনাবাসী রাতের শয্যা ছেড়ে দেয়। তীর-বর্শা তৈরীতে সবাই সরগরম। তীরভর্তি তুনীরের স্তূপ গড়ে উঠতে থাকে। বর্শাও তৈরী হতে থাকে। ঘোড়া, উটও প্রস্তুত করা হয়। পুরানো তলোয়ার তীক্ষ্ণ এবং নতুন তলোয়ার তৈরীর ধুম পড়ে যায়। নারী-শিশুরাও যুদ্ধ প্রস্তুতি নেয়। সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং

প্রস্তুতির চালচিত্র সরেজমিনে দেখতে রাসূল (সা.) এবং শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামকে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়।

মদীনার ঘরে ঘরে রণ-প্রস্তুতি চললেও একটি ঘরে ভিন্ন প্রকৃতির প্রস্তুতি চলছিল। এই ঘরটি অমুসলিম অধ্যুষিত। এক আগন্তুক সেখানে এসেছিল। ঘরে লোকজন বলতে এক বৃদ্ধ, আধা বয়সী এক পুরুষ, এক যুবতী নারী, আধা বয়স্কা এক মহিলা এবং দু'তিন বাচ্চা ছিল।

"আমি মুসলমানদের অভিপ্রায় জেনে এসেছি।" আগন্তুক বলে—"তাদের ইচ্ছা অগোচরে মক্কাবাসীদের কুপোকাত করা। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ যুদ্ধ-বিদ্যায় পাকা। সে যা বলেছে তা কাজে পরিণত করে দেখাবে।"

"তা আমরা কি করতে পারি?" বৃদ্ধ চোখ কপালে তুলে জানতে চায়।

"মাননীয় শ্রদ্ধাবর!" আগন্তুক বলে—"আমরা কিছু না পারলেও অন্তত মক্কাবাসীকে তো সতর্ক করতে পারি। তাদের এই পরামর্শ দিয়ে উপকার করতে পারি যে, পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নাও। চারপাশের গোত্রদেরকে আহ্বান কর। মক্কার পথে কোথাও ওঁৎ পেতে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। মক্কা পৌঁছা পর্যন্ত গেরিলা আক্রমণ করে করে তাদের দিশেহারা করে ফেল। এতে মুসলিম বাহিনী মক্কায় পৌঁছলেও তাদের শক্তি হ্রাস পাবে। আবেগে ভাটা পড়বে।

"আমার উপাস্যের কসম!" বৃদ্ধ আবেগী কণ্ঠে বলে—"তুমি বিবেকবান। ইহুদীবাদের সত্য পূজারী তুমি। খোদা তোমাকে যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। তুমি নিজেই মক্কা যেতে পার না?"

"না।" আগন্তুক বলে—"বর্তমানে মুসলমানরা যে-কোন অমুসলিমকে সন্দেহের চোখে দেখছে। তারা জানে আমি ইহুদী। আমি গেলে তারা সন্দেহ করবে।... তখন আমার জীবন নিয়ে টানাটানি দেখা দেবে। অথচ আমার বেঁচে থাকার অনেক প্রয়োজন। আমাকে ঐ ইহুদীদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে হবে মুসলমানরা যাদের হত্যা করেছে। আমার শিরা-উপশিরায় বনু কুরাইযার রক্ত ধাবমান। মুসলমানদেরকে টার্গেট করা আমার ফরজ কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে খোদা আমাকে ঐ কুকুরের মত মৃত্যু দিবেন যার সারা দেহে দগদগে ঘা এবং বড় বড় ফোঁড়া উঠেছে আর সে এই কষ্টে ছটফট করে মরে। আমি এ কঠোর প্রতিশোধ গোপনে নিতে চাই। ধরা খেতে চাই না। মুসলমানদের মরণ কামড় এবং বিষাক্ত দংশনের জন্য আমি বেঁচে থাকতে চাই।"

"আমি বৃদ্ধ।" বৃদ্ধ নিজের অপারগতা তুলে ধরে বলে—"মক্কা দূরের পথ। ঘোড়া বা উটে এত দীর্ঘ সফর করা সম্ভব নয়। আর করলেও মুসলমানদের আগে

মক্কায় গিয়ে পৌঁছতে পারব বলে মনে হয় না। গুরুত্বপূর্ণ এ কাজ কোন বাচ্চা বা মহিলা দ্বারাও সম্ভব নয়। আমার পুত্র ছিল; তবে সে অসুস্থ।"

"আমার দেয়া পুরস্কারের প্রতি একবার তাকাও"—আগন্তুক বলে, "এ কাজটি সম্পন্ন করে দিলে পুরস্কার ছাড়াও আমরা তোমাকে স্বীয় মাজহাবের অন্তর্গত করে আমাদের নিরাপত্তার অধীনে নিয়ে নিব।"

"আমাকে এ কাজের ভার দেয়া যেতে পারে?" আধা বয়স্কা মহিলা বলে— "তোমরা আমার উটনী দেখনি? উটনীর পিঠে তোমরা কখনও আমাকে দেখনি? এত দ্রুতগামী উটনী মদীনার কারো কাছে নেই।"

"হ্যাঁ।" ইহুদী বলে—"তুমি এ কাজটি করতে পার। উট এবং বকরীর পাল বাইরে নিয়ে যাবে। কেউ তোমাকে সন্দেহ করবে না। ভাবটা এমন দেখাবে যে, তুমি প্রত্যহ এ সমস্ত পশু চরাতে নিয়ে যাও। আজও সেই নিয়ম অনুযায়ী নিয়ে যাচ্ছ। পশু চরাতে চরাতে মদীনা থেকে কিছু দূর গিয়ে তোমার উটনীতে চেপে বসবে।"

ইহুদী একটি চিরকুট মহিলার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে—"চিরকুটটি চুলের বেনীর মাঝে লুকিয়ে ফেল। উটনী দ্রুত হাঁকিয়ে মক্কায় আবু সুফিয়ানের কাছে যাবে এবং বেনী থেকে এই চিরকুট বের করে তাকে হস্তান্তর করবে।

"দাও।" চিরকুটটি নিয়ে মহিলা বলে—"সমুদয় পুরস্কার আমার অপর হাতে তুলে দাও এবং এই নিশ্চয়তায় আমার ঘর থেকে প্রস্থান কর যে, মুসলমানরা যখন মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন তাদের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসবে। তাদের মস্তক থাকবে অবনত এবং সকলের কপালে এঁটে থাকবে পরাজয়ের তিলক।"

ইহুদী স্বর্ণের তিনটি টুকরা মহিলার হাতে তুলে দিতে দিতে বলে—"এটা ঐ পুরস্কারের অর্ধেক পত্রটি আবু সুফিয়ানকে হস্তান্তর করে ফিরে এলে যা আমি তোমাকে দিব।"

"যদি আমি কাজ সম্পন্ন করি কিন্তু জীবন নিয়ে ফিরে আসতে না পারি তাহলে কি হবে?" মহিলা জিজ্ঞাসা করে।

"বাকী পুরস্কার তোমার অসুস্থ স্বামী পাবে।" ইহুদী বলে।

॥ চুরানব্বই ॥

পত্রবাহক মহিলা উট-বকরী চরাতে নিয়ে যায়। সে পশুগুলো হাঁকাতে হাঁকাতে নিয়ে যাচ্ছিল। কেউ খেয়াল করে না যে, উটের পালের পিঠ শূন্য

থাকলেও একটি উটনীর পিঠ আরোহণের জন্য প্রস্তুত ছিল। উটনীর সাথে পানির মশক এবং খাদ্যভর্তি একটি থলেও বাঁধা ছিল। মহিলা পশুর পাল শহর থেকে দূরে নিয়ে যায়।

দীর্ঘ সময় অতিক্রান্তের পর ইহুদী ঘরে অবস্থানরত অপর তরুণীকে বলে— "সে হয়ত চলে গেছে। তুমি যাও; সন্ধ্যা নাগাদ পশুর পাল ফিরিয়ে আনবে।"

তরুণী হাতে মোটা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু সে শহরের বাইরে যাবার পরিবর্তে শহরের মধ্যে যায়। কাউকে অন্বেষণের মত সে এদিক-সেদিক ফালুক-ফুলুক করতে করতে যাচ্ছিল। সে একটি গলি দিয়ে যেতে যেতে একটি ফাঁকা ময়দানে এসে দাঁড়ায়। ময়দানে মুসলমানরা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে অস্ত্রচালনার ট্রেনিং দিচ্ছিল। ময়দানের অপর পার্শ্বে উট দৌড়ের কসরতও চলছিল। দর্শকদেরও প্রচণ্ড ভীর ছিল সেখানে।

তরুণী দর্শকদের চারপাশে ঘুরঘুর করতে থাকে। তার চোখ কাউকে খুঁজে ফিরছিল। সে দ্রুতবেগে চক্কর দিতে থাকে। তরুণীর এই অস্বাভাবিক আচরণ অপর এক তরুণের দৃষ্টি কাড়ে। সে দ্রুতপদে তার পিছু নেয় এবং নিকটে গিয়ে চাপা গলায় ডাক দেয়—"যারিয়া!" তরুণী চমকে পিছে তাকায় এবং তার চেহারা থেকে পেরেশানীর ছাপ মুহূর্তে ডানা মেলে উড়াল দেয়।

"সেখানে এস, কথা আছে।" তরুণী ঝটপট বলে দ্রুত সামনের দিকে পা চালায়।

'সেখানে' এর দ্বারা পশুপালের চারণভূমির প্রতি ইঙ্গিত ছিল। তরুণ পূর্ব হতে এ ইঙ্গিত সম্পর্কে অবগত থাকায় কথা না বাড়িয়ে পূর্বের স্থানে ফিরে আসে এবং মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

যারিয়ার ঐ ইঙ্গিতকৃত স্থানে যেতে বেশ সময় লেগে যায় যেখানে পত্রবাহক মহিলা উট-বকরী চরাতে নিয়ে যেত। যারিয়া উট-বকরী নির্দিষ্ট চারণভূমিতেই পায়। তবে সেখানে পত্রবাহক মহিলা আর তার উটনী ছিল না। যারিয়া চারণভূমির পাশে গিয়ে এমন ভঙ্গিতে বসে যে, সে এখানে বকরী চরাতেই এসেছে। তরুণী স্থির বসে থাকে না। বারবার দাঁড়িয়ে শহর পানে চায়। তার উদ্দেশে কাউকে আসতে সে দেখতে পায় না। সে আবার উদ্বিগ্ন হতে শুরু করে।

সূর্য যখন অস্ত যেতে পশ্চিম দিগন্তে দাঁড়িয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন তাকে আসতে দেখা যায়। যারিয়া তাকে আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বসে পড়ে।

"উহ্ উবায়দ!" যারিয়া তাকে কাছে টেনে বসাতে বসাতে বলে—"তুমি এত দেরী করলে কেন; আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলাম।"

"আমি তোমাকে উদ্বেগের ঔষধ বলে দিইনি?" উবায়দ বলে—"আমার ধর্মে চলে আসলে তোমার সকল পেরেশানী-দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে। ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে স্ত্রীত্বে বরণ করতে পারি না। চিন্তা করে বলত, এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন পর্যন্ত আমাদের সাক্ষাৎ করা সম্ভব!"

"এ আলোচনা পরে করা যাবে।" যারিয়া বলে—"আমার ভালবাসা ধর্মের অধীন নয়। আমি তোমার সত্তাকে পূজা করি। স্বপ্নেও তোমাকে দেখি। কিন্তু আজ আমার অন্তরে ভারী পাথর এসে পড়েছে।"

"কেমন করে?" উবায়দ উৎসুক হয়ে জানতে চায়।

"মুসলমানরা মক্কায় হামলা করতে যাচ্ছে।" যারিয়া বলে—"তুমি যেয়ো না উবায়দ। তোমার ধর্মের কসম দিয়ে অনুরোধ করি তুমি যেয়ো না।...দুর্ভাগ্যক্রমে এমন না হয়...।"

মক্কাবাসীদের ধড়ে এখন আর এমন শক্তি নেই যে, তারা আমাদের জোরালো মোকাবেলা করবে।" উবায়দ বলে—"কিন্তু যারিয়া! তাদের মধ্যে শক্তি থাক বা না থাক আমার নবী (সা.) যদি আমাকে আগুনেও ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তবে আমি সে নির্দেশও যথাযথ পালন করব।...অন্তরে ব্যথা নিও না যারিয়া! আমাদের এই হামলা এমন গোপনীয় হবে যে, মক্কাবাসী আক্রমণ সম্পর্কে তখন জানতে পারবে যখন আমাদের তলোয়ার তাদের মস্তকের উপর চকচক করতে থাকবে।"

"এমনটি হবে না উবায়দ!" যারিয়া একদিকে দুশ্চিন্তার ঝড় অপরদিকে আবেগের আতিশয্যে উবায়েদের মাথা নিজের বক্ষে টেনে নিয়ে বলে—"যা ভেবেছ তা হবে না। তারা ওঁৎ পেতে বসে থাকবে। অদ্য রাতের শেষ প্রহর কিংবা কাল সকালে আবু সুফিয়ান বরাবর এ বার্তা পৌঁছে যাবে যে, তোমাদের অগোচরে মুসলমানরা তোমাদের ঘায়েল করতে আসছে।... তুমি যেয়ো না উবায়দ! কুরাইশ এবং তাদের মিত্র গোত্ররা সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করবে।"

"একি বলছ যারিয়া!" উবায়দ শক খাওয়ার মত তার বক্ষ থেকে মাথা উত্তোলন করে জিজ্ঞাসা করে—"আবু সুফিয়ান বরাবর কে বার্তা প্রেরণ করেছে?"

"এক ইহুদী।" যারিয়া তথ্য ফাঁস করে দেয়—"আর বার্তা বয়ে নিয়ে গেছে আমার বড় ভাইয়ের পত্নী।...আমার ভালবাসার গভীরতা অনুমান কর উবায়দ। যে তথ্য ফাঁস করার ছিল না, তা আমি তোমাকে অবহিত করলাম। এর একমাত্র উদ্দেশ্য, যেন কোন বাহানায় তুমি রয়ে যাও। কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্র মুসলমানদের এমন কচুকাটা করবে যে, একান্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই কেবল জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারবে।"

উবায়দ যারিয়া হতে জেনে নেয় যে, তার ভাবী কিভাবে এবং কখন রওনা হয়েছে। উবায়দ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং যারিয়ার মত রূপসী-যুবতী ললনা এবং তার আন্তরিক ভালবাসা উপেক্ষা করে মদীনা নগর লক্ষ্যে ছুটে চলে। পশ্চাৎ হতে যারিয়ার এই আহ্বান তার কানে বারবার আঘাত করে—"উবায়দ!...দাঁড়াও উবায়দ!" অতঃপর একসময় উবায়দ যারিয়ার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

॥ পঁচানব্বই ॥

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিস্তারিতভাবে জানানো হয় যে, এক মহিলা দ্রুতগামী উটনীতে চেপে আবু সুফিয়ানের নামে একটি পত্র চুলের বেনীতে করে লুকিয়ে নিয়ে গেছে। মহিলাটি এখন সম্ভবত পথেই আছে। রাসূল (সা.) তৎক্ষণাৎ হযরত আলী (রা.) এবং হযরত জুবাইর (রা.)-কে ডেকে ঐ মহিলা এবং তার উটনীর নমুনা সম্পর্কে অবগত করিয়ে ঐ মহিলাকে পথিমধ্যেই গ্রেপ্তার করতে প্রেরণ করেন।

হযরত আলী এবং হযরত জুবাইর (রা.)-এর ঘোড়া আরবের উন্নত জাতের তাজি ঘোড়া ছিল। তারা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে মক্কা অভিমুখে বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। এ সময় সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। যখন তারা মদীনা থেকে অনেক দূরে চলে যান তখন সূর্য পুরোপুরি অস্ত যায়। সূর্যের অস্তগমনে দিন থমকে দাঁড়ালেও তাদের ঘোড়া থামে না। আঁধারের পর্দা ছিন্ন ভিন্ন করে তারা এগিয়ে চলে মহিলাকে গ্রেফতার এবং পত্র উদ্ধারের জন্য।

পরের দিন সূর্যের আলোর মধ্য থেকে আবির্ভাব ঘটে হযরত আলী (রা.) ও হযরত জুবাইর (রা.) এর। পূর্বাকাশে সূর্য উদয়ের সাথে সাথে তারাও মদীনায় এসে উপস্থিত হন। তাদের দু'অশ্বের সাথে একটি উটনী শোভা পাচ্ছিল। উটনীর পিঠ দখল করে ছিল এক মহিলা। কয়েকজন লোক ঐ মহিলাকে দেখেই চিনতে পারে। মহিলাকে রাসূল (সা.)-এর সকাশে হাজির করা হয়। তার চুলের বেনীতে লুক্কায়িত পত্রও রাসূল (সা.)-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। পত্র পড়ে রাসূল

(সা.)-এর চেহারা রাগে লাল হয়ে যায়। পত্রের বিবরণ ছিল বড়ই ভয়ানক। মহিলা নিজের অপরাধ স্বীকার করে এবং এ ঘটনার মূল হোতা যে ইহুদী তার নামও বলে দেয়। রাসূল (সা.) রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগে ঐ মহিলার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। কিন্তু ঐ ইহুদী বিপদের আভাস পেয়ে পূর্বেই চম্পট দেয়। কোথাও তার হদিস পাওয়া যায় না। এ পত্র মক্কায় পৌঁছলে মুসলমানদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হত। মক্কা অভিযানের নেতৃত্ব দেন খোদ আল্লাহ্র নবী (সা.)।

রাসূল (সা.) প্রস্তুতি গভীর পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং যাত্রার নির্দেশ দেন।

এ অভিযানে মোট দশ হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য অংশগ্রহণ করে। এ বাহিনীতে মদীনার পার্শ্ববর্তী বসতির সদ্য ইসলাম গ্রহণ করা লোকও ছিল। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, মুসলিম বাহিনী পথ অতিক্রমকালে আরো দু'তিন গোত্র তাদের সাথে এসে যোগ দেয়। প্রায় সকল মুসলিম-অমুসলিম ঐতিহাসিকের রিপোর্ট হলো, রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনীর চলার গতিতে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ছিল এবং এটাই ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম যুদ্ধাভিযান, যার সৈন্যসংখ্যা ছিল দশ হাজার।

সেনাবাহিনী মক্কার উত্তর-পশ্চিমে 'মাররুজ্জোহ্র' নামক উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছে। এটা ছিল মক্কা হতে আনুমানিক দশ মাইল দূরে। এই উপত্যকার একাংশের নাম ফাতেমা উপত্যকা। রাসূল (সা.)-এর আন্তরিক ইচ্ছা অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হয়। তিনি চেয়েছিলেন, মক্কাবাসীদের অজান্তে তাদের ঘাড়ে চেপে বসবেন। মক্কার এত কাছে পৌঁছে গেলেও মক্কাবাসীদের কোন খবর ছিল না। এখন জানলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ, কুরাইশদের পক্ষে এখন পার্শ্ববর্তী গোত্রদের সাহায্যের জন্য ডাকার কোন সুযোগ ছিল না। রাসূল (সা.) মক্কার অবস্থা এবং গতিবিধি জানতে বিভিন্ন বেশে কয়েকজন লোক মক্কার আশেপাশে পাঠিয়ে দেন।

॥ ছিয়ানব্বই ॥

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মদীনাবাহিনী আবার রওনা হয়। যু'ফা নামক স্থানে এসে অগ্রবর্তী বাহিনী মক্কার দিক হতে একটি কাফেলাকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসতে দেখতে পায়। কাফেলাকে আরো কাছে আসার সুযোগ দেয়া হয়। নিকটে এলে দেখা যায় তারা আর কেউ নয়; খোদ রাসূল (সা.)-এর চাচা-পরিবার।

হযরত আব্বাস (রা.) তাঁর পরিজনদের নিয়ে মদীনার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। হযরত আব্বাস (রা.)-কে রাসূল (সা.)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

"কি আব্বাস!" রাসূল (সা.) বলেন—"মক্কায় কেয়ামত কায়েম হতে যাচ্ছে বলেই কি তুমি মক্কা থেকে পালাচ্ছ?"

"খোদার কসম! মক্কাবাসীদের খবরই নেই যে, মুহাম্মাদের বাহিনী তাদের মাথার উপর খাড়া।" হযরত আব্বাস (রা.) বলেন—"আমি তোমার আনুগত্য স্বীকার করার উদ্দেশে মদীনায় রওনা হয়েছিলাম।"

"আমার না আব্বাস!" রাসূল (সা.) তার ভুল ভেঙ্গে দিয়ে বলেন—"আনুগত্য ঐ সত্তার কর, যিনি এক এবং যার কোন শরীক নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদাতের উপযুক্ত। আমি তাঁর প্রেরিত নবী মাত্র।"

হযরত আব্বাস (রা.) ইসলাম কবুল করেন। রাসূল (সা.) তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। রাসূল (সা.) এ খবরে অত্যন্ত আনন্দিত হন যে, মক্কাবাসী নিশ্চিন্তায় নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

হযরত আব্বাস (রা.) পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুভব করে রাসূল (সা.)-কে বলেন, কুরাইশরা আর যাই হোক আমাদেরই তো রক্ত। দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীর পদতলে কুরাইশদের নারী এবং বাচ্চারাও পিষ্ট হয়ে যাবে। তিনি রাসূল (সা.)-কে আরো জানান যে, কুরাইশদের বর্তমান মানসিকতা পূর্বের মত নয়। তাদের মাঝে ইসলাম কবুলের এক ঢেউ জেগেছে। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের একটি শেষ সুযোগ দিলে ভাল হয় না?"

রাসূল (সা.) হযরত আব্বাস (রা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলেন, তাহলে তুমি নিজেই মক্কা যাও এবং আবু সুফিয়ানকে জানাও যে, মুসলমানরা মক্কা দখল করতে আসছে। মক্কাবাসী প্রতিরোধে অবতীর্ণ হলে একজনকেও প্রাণে রক্ষা করা হবে না। বিনা রক্তপাতেই সে যেন মক্কা নগরী মুসলমানদের কাছে হস্তান্তর করে।

রাসূল (সা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কে মক্কা যেতে কেবল অনুমতিই দেন না; তাকে নিজের খচ্চরও বাহন হিসেবে দেন। রাসূল (সা.) ঘোড়া ছাড়াও এই বাহনটি নিজের সাথে রাখতেন।

আবু সুফিয়ান মদীনা হতে বড় উদ্বেগজনক প্রতিক্রিয়া নিয়ে গিয়েছিল। সে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিল। মুসলমানদের বীরত্ব এবং দৃঢ়তা সম্পর্কেও তার সম্যক ধারণা ছিল। তার সর্বক্ষণ আশঙ্কা হত এই বুঝি মুসলমানরা মক্কা আক্রমণ করল। স্ত্রী হিন্দা, সেনাপতি ইকরামা ও সফওয়ান তার সাহস বাড়াতে চেষ্টা

করত কিন্তু ব্যক্তি মর্যাদা এবং জাতির ধ্বংসই শুধু তার চোখে ভাসতে থাকে। তার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।

একদিন সে এত বেশী বিচলিত হয়ে পড়ে যে, সহ্য করতে না পেরে ঘোড়ায় চেপে মক্কার বাইরে চলে আসে। তার মনে বারবার জাগছিল যে, অচিরেই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এই চিন্তা তাকে আতঙ্কের আরো গভীর আবর্তে নিক্ষেপ করে। সে মনকে এই বলে আশ্বস্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে যে, এই মুহূর্তে একমাত্র ঘটার যা আছে তা হলো মুসলমানরা মক্কা আক্রমণ করতে আসবে। এই ধারণা তার মনে এত জোরালো আলোড়ন তোলে যে, সে মদীনার পথে একাকী এটা দেখতে বেরিয়ে পড়ে যে, মদীনাবাহিনী এসে তো পড়েনি? বাতাসেও এক ধরনের পরিবর্তনের আভাস তার কাছে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। যতই সে এগিয়ে যায় এ বাতাস ততই ভারী মনে হতে থাকে।

এহেন গভীর এলোপাথাড়ি চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়ে তার ঘোড়া তাকে কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়। বহু দূরের একটি দৃশ্যে তার চিন্তাভঙ্গ হয়। খচ্চরের পিঠে চেপে তারই দিকে হযরত আব্বাস (রা.)-কে আসতে দেখে সে। আবু সুফিয়ান বিস্মিত হয়ে ঘোড়া দাঁড় করায়। তার চোখে একঝাঁক প্রশ্ন। চেহারায় উদ্বেগ-কৌতূহল।

"আব্বাস!" আবু সুফিয়ান দূর থেকেই প্রশ্ন করে—"তুমি পুরো পরিবারের সাথে গিয়েছিলে না? তাহলে আবার ফিরে এলে কেন?"

"আমার পরিবার নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।" হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, "পদাতিক, অশ্বারোহী এবং উষ্ট্রারোহী মিলে সর্বমোট দশ হাজারের এক বিশাল বাহিনী মক্কার এত কাছে এসে পড়েছে যে, তাদের নিক্ষিপ্ত তীর মক্কার যে কোন দরজা টার্গেট করতে পারে। এ বিশাল বাহিনীর আক্রোশ থেকে মক্কা রক্ষা করা তোমার পক্ষে সম্ভব? সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকার সুযোগ আছে তোমার? সন্ধিচুক্তি তোমার সেনাপতিরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। মুহাম্মাদকে আমি আল্লাহ্র রাসূল বলে স্বীকৃতি দিয়েছি। তারা সর্বপ্রথম তোমাকে কতল করবে। তুমি আমার সাথে রাসূল (সা.)-এর কাছে গেলে তোমার জীবন রক্ষা পেতে পারে।"

"খোদার কসম! আমি জানতাম, এমন মুহূর্ত অবশ্যই আসবে।" আবু সুফিয়ান বলে—"চল, আমি তোমার সাথে যাচ্ছি।"

॥ সাতানব্বই ॥

সন্ধ্যার পর হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে নিয়ে মুজাহিদ সেনা ছাউনীতে প্রবেশ করে। হযরত উমর (রা.) এ সময় প্রহরীদের সতর্কতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। তিনি আবু সুফিয়ানকে দেখে অগ্নিশর্মা হয়ে যান এবং বলেন, আল্লাহ্র দ্বীনের এই দুশমন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতি ছাড়াই আমাদের ক্যাম্পে প্রবেশ করেছে। হযরত উমর (রা.) আবু সুফিয়ানের হত্যার অনুমতি চাইতে রাসূল (সা.)-এর তাঁবুর দিকে দৌড়ে যান। হযরত আব্বাস (রা.)-ও সেখানে গিয়ে পৌঁছান। রাসূল (সা.) হত্যার অনুমতি দেন না এবং তিনি আবু সুফিয়ানকে সকালে আসতে বলেন। হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে রাতে নিজের সাথে রাখেন।

"আবু সুফিয়ান!" রাসূল (সা.) সকালে আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেন—"তুমি জান আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই; তিনিই একমাত্র মা'বুদ এবং তিনিই সকলের সাহায্যকারী?"

আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, এতদিন যে সমস্ত মূর্তির ইবাদত করতাম তারা প্রতিমা বৈ নয়।" আবু সুফিয়ান বলে—"তারা আমাকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না।"

তাহলে কেন স্বীকার করছ না যে, আমি ঐ আল্লাহ্র রাসূল, যিনি একমাত্র মাবুদ?" রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"আমার দ্বারা হয়ত এটা স্বীকার করা সম্ভব হবে না যে, তুমি আল্লাহ্র রাসূল।" আবু সুফিয়ান অপারগতার সুরে বলে।

"আবু সুফিয়ান!" হযরত আব্বাস (রা.) ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলেন—"তুমি আমার তলোয়ারে তোমার মস্তক ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাও?" এরপর হযরত আব্বাস (রা.) রাসূল (সা.)-কে বলেন—"হে আল্লাহ্র রাসূল! আবু সুফিয়ান একটি জাতির নেতা। সে প্রভাবশালী এবং সম্ভ্রান্তও বটে। সে নিজ ইচ্ছায় এসেছে।"

হযরত আব্বাস (রা.)-এর কথায় আবু সুফিয়ানের মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। তার জবান থেকে সহসা বেরিয়ে যায়—"মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল!...আমি স্বীকার করছি। আমি মেনে নিলাম।"

"যাও।" রাসূল (সা.) হযরত আবু সুফিয়ান রা.)-কে বলেন—"মক্কায় গিয়ে ঘোষণা করে দাও যে, যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে তারা মুসলমানদের তলোয়ার থেকে নিরাপদ থাকবে। যারা বাইতুল্লায় প্রবেশ করে

থাকবে তারাও নিরাপদ। এমনকি তাদেরও কেশাগ্র স্পর্শ করা হবে না যারা নিজ নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে অবস্থান করবে।"

"হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) তৎক্ষণাৎ মক্কায় রওনা হয়ে যান। এদিকে রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল, হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) মুসলমান হলেও ইকরামা এবং সফওয়ানের মত দক্ষ সেনাপতি এখনও মক্কায় রয়েছে। তারা কি লড়াই ছাড়া মক্কা পদানত করতে দেবে? সাহাবায়ে কেরাম নির্ধারিত এ পয়েন্টে স্বাধীন মতামত ও বিজ্ঞ পরামর্শ পেশ করতে থাকেন।

॥ আটানব্বই ॥

উট বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসছিল। মক্কার নিকটে পৌঁছলে উষ্ট্রারোহী চিৎকার করে বলতে থাকে—"উয্যা এবং হুবলের কসম! মদীনার বাহিনী 'মাররুজ্জোহরায়' অবস্থান করছে। আমাদের নেতাকে আমি সেখানে যেতে দেখেছি।... কুরাইশবাসী! সাবধান! মুহাম্মাদের সৈন্যরা আসছে।" সে উট থামায় কিন্তু তাকে বসিয়ে তার পিঠ থেকে নামার পরিবর্তে লাফ দিয়ে নিচে নামে।

যার কানেই এ আওয়াজ পৌঁছে সেই দৌড়ে আসতে থাকে। সে কারো দিকে না তাকিয়ে আতঙ্কিতভাবে বলে যাচ্ছিল, মদীনার সৈন্য মাররুজ্জোহরা পর্যন্ত এসে গেছে। আবু সুফিয়ানকে সেদিকে যেতে দেখেছি। মক্কার লোকজন তার চারপাশে জড়ো হতে থাকে।

"আবু হাসানা!" এক প্রবীণ লোক তাকে বলে—"হয়ত তোমার মাথা ঠিক নেই নতুবা তুমি মিথ্যা বলছ।"

"আমার কথা মিথ্যা মনে করলে অচিরেই তার পরিণতি দেখতে পাবে।" উষ্ট্রারোহী আবু হাসানা বলে—"কাউকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমাদের নেতা ওদিকে যাওয়ার কারণ কি? সে একথা বলে আবার জোরে জোরে বলতে থাকে, "কুরাইশবাসী! মুসলমানরা ভাল নিয়তে আসেনি।"

আবু হাসানার চিৎকার এগলি-ওগলি অতিক্রম করে এক সময় হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী হিন্দার কানে গিয়ে পৌঁছে। সে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলে উঠে বাইরে আসে। আবু হাসানাকে ঘিরে রাখা জনতার সারি চিরতে চিরতে সে আবু হাসানার কাছে এসে পৌঁছে।

"আবু হাসানা!" হিন্দা আবু হাসানার জামার কলার ধরে বলে—"আমার তলোয়ার মুহাম্মাদের রক্তের পিয়াসী। তুই কেন নিজের গর্দান আমার তলোয়ারে

কাটাতে এলি? তুই জানিস না যার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছিস সে আমার স্বামী এবং কুরাইশ জাতির নেতা?"

"আপনার তলোয়ার ঘর থেকে নিয়ে আসুন।" আবু হাসানা বলে—"কিন্তু আপনার স্বামী এলে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, সে কোথা থেকে এল।

"মুহাম্মাদ সৈন্য নিয়ে এসেছে, একথাও তুই বলছিস?" হিন্দা জিজ্ঞাসা করে।

"খোদার কসম!" আবু হাসানা বলে—"আমি চোখে যা দেখেছি মুখে তা বলছি।"

"তোর কথা সত্য হয়ে থাকলে মুসলমানরা মৃত্যু সাথে করেই এনেছে।" হিন্দা বলে।

এ সময় হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-কে দূর থেকে আসতে দেখা যায়।

॥ নিরানব্বই ॥

মক্কার জনতা এখন এক ময়দানে দাঁড়ানো। রাসূল (সা.)-এর অভিযানের খবর আর গোপন থাকে না। কিন্তু এখন জানায় কোন অসুবিধা ছিল না। তারা ঊর্ধ্বে নিজেরা প্রস্তুতি নিতে পারত। সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকার পথ ছিল সম্পূর্ণ রুদ্ধ।

হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) আসছিলেন। নেতার আগমনে জনতার আওয়াজ থেমে যায়। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী হিন্দা জনতাকে ডানে-বায়ে ধাক্কা দিতে দিতে আগে চলে যায়। তার চেহারা ছিল বিস্ফোরনোন্মুখ। তার চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিল। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) জনতার মাঝে এসে ঘোড়া দাঁড় করান। স্ত্রী হিন্দাকে অগ্নিগোলকের মত ছুটে আসতে দেখেও তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না।

"প্রিয় কুরাইশ জাতি!" হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) উচ্চকণ্ঠে বলেন—"প্রথমে আমার কথা মনোযোগ সহকারে শোন এরপর কোন কথা থাকলে বলব। আমি তোমাদের নেতা। তোমাদের মর্যাদা রক্ষা করা আমার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।...মুহাম্মাদ এত বেশী সৈন্য নিয়ে এসেছে যে, তাদের মোকাবেলা করতে গেলে তোমরা নির্ঘাত মারা পড়বে। অবলা নারী এবং দুর্বল শিশুদের রক্ষা কর। আসন্ন বাস্তবতা মেনে নাও। পালিয়ে যাবার পথও তোমাদের জন্য রুদ্ধ।"

"সম্মানিত নেতা! আপনিই বলে দিন, আমাদের এখন করণীয় কি?" জনতার মাঝ হতে আওয়াজ আসে।

"মুহাম্মাদের আনুগত্য মেনে নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই।" হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) বলেন।

"খোদার কসম! তারপরেও মুসলমানরা আমাদের ক্ষমা করবে না।" জনগণের আতঙ্কিত ধ্বনি পুনরায় শোনা যায়—"তারা নিহতদের বদলায় আমাদের হত্যা করবে। তারা সর্বপ্রথম আপনাকে হত্যা করবে। কারণ, উহুদে আপনার স্ত্রীই তাদের লাশের বিকৃতি ঘটিয়েছিল।"

হিন্দা একাকী দাঁড়িয়ে কালনাগিনীর মত ফুঁসছিল।

"আমি তোমাদের সকলের জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এসেছি।" হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) বলেন—"আমি মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি। তিনি বলেছেন, যারা তোমার ঘরে আশ্রয় নিবে তারা মুসলমানদের তুফান থেকে নিরাপদ থাকবে।"

"মক্কার সমস্ত মানুষের ঠাঁই আপনার ঘরে হওয়া সম্ভব?" একজন প্রশ্ন করে।

"না।" হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) বলেন—"মুহাম্মাদ (সা.) আরও বলেছেন যে, যারা নিজ নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে ভিতরে অবস্থান করবে তাদেরকেও মুসলমানরা কিছু বলবে না।...যারা কা'বা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিবে তাদেরকেও কিছু বলা হবে না। তারা শত্রু হিসেবে কেবল তাদেরকেই গণ্য করবে, যারা সশস্ত্র হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে।" এরপর তিনি ঘোড়া হতে নেমে আসেন এবং বলেন, "তোমাদের নিরাপত্তা এবং সম্মান এরই মাঝে নিহিত যে, তোমরা প্রিয় বন্ধু এবং সহোদরের মত তাদের অভ্যর্থনা জানাবে।

"আবু সুফিয়ান!" কুরাইশদের প্রখ্যাত সেনাপতি গর্জে উঠে বলে—"আমাদের হত্যাকারীদের অভ্যর্থনা আমরা তরবারী এবং বর্শা দ্বারা করব।"

"আমাদের তীর মক্কার অদূরেই তাদের স্বাগতম জানাবে।" কুরাইশদের অপর বাহাদুর ও অভিজ্ঞ সেনাপতি সফওয়ান বলে, "দেবতাদের কসম! দরজা বন্ধ করে আমরা ঘরে বসে মাছি মারব না।"

"পরিস্থিতি বিবেচনা কর ইকরামা!" হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) বলেন—"বিচক্ষণতার সাথে কথা বল সফওয়ান! তারা আমাদের লোক বৈ তো নয়। খালিদ তাদের সাথে গিয়ে যোগ দিলেও এটা তো এড়িয়ে যেতে পারবে না যে, তার বোন ফাখিতা তোমার স্ত্রী। তোমার স্ত্রীর ভাইকে তুমি হত্যা করতে পারবে?...তোমার মনে নেই যে, আমার কন্যা উম্মে হাবীবা মুহাম্মাদের স্ত্রী? তুমি বিশ্বাস করতে চাইবে না যে, কুরাইশ জাতির ইজ্জত ও মর্যাদার খাতিরে আমি

মদীনা গেলে আমার ঔরসজাত এই কন্যা আমার কথা শুনতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। আমি মুহাম্মাদের ঘরের খাটে বসতে গেলে উম্মে হাবীবা বিছানা চাদর টেনে সরিয়ে নিয়েছিল।...পিতা কখনো কন্যার শত্রু হতে পারে না সফওয়ান।”

ইকরামা, সফওয়ান এবং আরো দুই-তিনজন লোক ছাড়া উপস্থিত জনতা খামুশ ছিল। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, তাদের এই নীরবতাই বলে দিচ্ছিল যে, তারা হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর পরামর্শ মেনে নেয়। এতে হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর চেহারায় স্বস্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী হিন্দা এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে এবার ছোঁ মারার জন্য দ্রুতগতিতে হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর দিকে এগিয়ে যায়। সবাইকে বিস্ময়ের ঘোরে ঠেলে দিয়ে সে সোজা গিয়ে হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর ঈষৎ প্রলম্বিত গুম্ফকেশ জোরে মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে।

“সবার আগে তোকে হত্যা করব।” হিন্দা হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর গোঁফ ধরে হেঁচকা টান দিতে দিতে বলে—“কাপুরুষ বুড়ো কোথাকার! তুই আজ জাতির সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিলি?” এরপর সে আবু সুফিয়ান-এর গোঁফ ছেড়ে দিয়ে তার মুখে জোরে থাপ্পড় মারে এবং জনতাকে সম্বোধন করে বলে “তোমরা এই বুড়োকে কেন হত্যা করছ না, যে মুসলমানদের হাতে তোমাদের লাঞ্ছনা-অবমাননার কথা বলছে?”

ঐতিহাসিক, যুদ্ধবেত্তা এবং ইবনে সাদ লেখেন, হিন্দা তার স্বামীর সাথে এমন অপমানজনক আচরণ করলে জনতার মাঝে পিনপতন নীরবতা নেমে আসে। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) জ্যান্ত মূর্তিতে পরিণত হন। ইকরামা এবং সফওয়ান তাদের মধ্যখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

“আমরা লড়ব হিন্দা।” সফওয়ান বলে—“তার পথ ছেড়ে দাও। মুহাম্মাদের জাদুতে সে আক্রান্ত।”

অপরাহ্নের আগে আগে কুরাইশ জাতি দু'শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। সিংহভাগ ছিল লড়াই না করার পক্ষে। বাদ বাকীরা ইকরামা, সফওয়ান ও হিন্দার পক্ষ অবলম্বন করে।

॥ একশত ॥

সন্ধ্যার পর সফওয়ান ঘরে ফেরে। তার স্ত্রী ফাখিতা হযরত খালিদ (রা.)-এর বোন, সেও হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর বক্তব্য শুনছিল।

"তুমি গোত্র-প্রধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছ বলে যে খবর শুনছি তা কি সত্য?" ফাখিতা সফওয়ানকে জিজ্ঞাসা করে।

"তার আনুগত্য করলে পুরো জাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।" সফওয়ান বলে, "গোত্রপ্রধান কাপুরুষ হলেও গোত্রের কাপুরুষ হওয়া ঠিক নয়। সে গোত্রের দুশমনকে দোস্ত হিসেবে মেনে নিলেও তারা কখনও গোত্রের বন্ধু হতে পারে না।"

"তবে কি তুমি মুসলমানদের মোকাবেলা করতে চাও?" ফাখিতা স্বামীকে শুধায়।

শত্রু দরজার সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে রাউন্ড দিবে আর তোমার স্বামী ঘরের কোণে স্ত্রীর আঁচলের আড়ালে বসে থাকবে—এটা তুমি ভাল মনে করবে? আমার বাহু কি ভেঙ্গে গেছে? আমার তরবারী দ্বিখণ্ডিত? ঐ লাশ দেখে তুমি গর্ব করবে না, যা তোমার গৃহদ্বারে জনগণ একথা বলে পৌছে দিয়ে যাবে যে, এই তোমার স্বামীর মরদেহ; দেশ ও জাতির জন্য বীরত্বের সাথে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে? না কি ঐ স্বামী তোমার অতি প্রিয়, যে তোমার আঁচলের তলে লুকিয়ে থাকবে আর মানুষ তোমাকে ভর্ৎসনার সুরে বলবে, এ এক কাপুরুষ এবং আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তির স্ত্রী, যে স্বীয় বসতি এবং উপাসনালয় শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছে।...তুমি আমাকে কোন্ অবস্থায় দেখতে চাও?"

"তোমাকে নিয়ে চিরদিন গৌরব করি সফওয়ান?" ফাখিতা বলে, "মহিলারা আমাকে বলে তোমার স্বামী জাতির চোখের তারা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিত কিছুটা ভিন্নতর। তোমার পাশে এসে দাঁড়াবার লোক খুবই কম। শুনেছি মদীনাবাসীদের সংখ্যা অনেক। আমার ভাই খালিদও এখন তাদের সাথে। সে কেমন বাহাদুর তা তুমি ভাল করেই জান।"

"তোমার ভাইয়ের ভয় আমাকে দেখাচ্ছ ফাখিতা?" সফওয়ান বলে।

"না, প্রিয়!" ফাখিতা বলে—"তার দেখা পেলে তাকেও আমি ঐ কথা বলতাম যা তোমাকে বলছি।...সে আমার ভাই। তোমার হাতে সে মারা যেতে পারে। তার হাতে তোমারও মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। আর যাই কর, তোমরা একে অপরের মোকাবেলা করো না। আমি তার বোন আর তোমার স্ত্রী। তোমার লাশ হোক কিংবা খালিদের—আমার শোক সমান হবে।"

"এ কথায় কোন নতুনত্ব নেই ফাখিতা!" সফওয়ান বলে—"বিরোধ ও বিভেদের মাত্রা এত তীব্র যে, তা পিতা-পুত্র এবং ভাই-ভাইয়ের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। যদি আমি তোমার রক্তের সম্পর্কের প্রতি খেয়াল রাখি তাহলে... ।"

"আমার রক্তের সম্পর্ক বিবেচনা করার দরকার তোমার নেই।" ফাখিতা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে—"গোত্রের সর্দার চান লড়াই না হোক। তিনি মুহাম্মাদের আনুগত্য স্বীকারের পক্ষপাতী। তবে তুমি কেন লড়াইয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করছ না? তোমার পাশে খুব কম লোকই পাবে।"

"আমি আনুগত্য স্বীকার করব না।" সফওয়ান সিদ্ধান্তের ভঙ্গিতে জানায়।

"তাহলে আমার এই কথাটি অন্তত রাখ।" ফাখিতার কণ্ঠে অনুনয় ঝরে পড়ে—"খালিদের সামনাসামনি তুমি হবে না। তাকে আমার মা প্রসব করেছে। আমরা দু'জন একই মায়ের দুধ পান করেছি। সে যেখানেই থাক, বোন এটাই শুনতে চায় যে, তার ভাই জীবিত।...আমি বিধবাও হতে চাই না সফওয়ান!"

ভাইয়ের প্রতি এত দরদ থাকলে তাকে গিয়ে বল, সে যেন মক্কার ধারে কাছেও না আসে।" সফওয়ান মৃদু তিরস্কার করে বলে—"সে আমার সামনে এলে আত্মীয়তার বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হয়ে যাবে।"

ফাখিতার অশ্রু সফওয়ানের ইচ্ছায় বিন্দুমাত্র রদবদল ঘটাতে পারে না।

॥ একশ এক ॥

রাসূল (সা.) আরেকটি পদক্ষেপ নেন। তিনি কতক লোককে বিভিন্ন বেশে মক্কার চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের কাজ ছিল, মক্কা হতে কেউ বেরিয়ে কোথায় যেতে দেখলে তাকে বন্দী করা। এর উদ্দেশ্য ছিল, কুরাইশরা যেন তাদের মিত্রগোত্রদেরকে সাহায্য চেয়ে আহ্বান করতে না পারে।

দ্বিতীয় দিনই দুই উষ্ট্রারোহীকে বন্দী করে আনা হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে সাধারণ মুসাফির লাগছিল। তাদেরকে মুসলিম সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। হাল্কা হুমকিতেই তারা নিজেদের সঠিক পরিচয় জানিয়ে দেয়। একজন ইহুদী আর অপরজন কুরাইশী ছিল। তারা মক্কা হতে কয়েক মাইল দূরে বনু বকরকে এটা জানাতে যাচ্ছিল যে, মুসলমানরা মাররুজ্জোহরা নামক স্থানে এসে অবস্থান করছে। গ্রেপ্তারকৃত দু'গোয়েন্দা মারফত বনু বকরের উদ্দেশে এ বার্তা পাঠানো হচ্ছিল যে, তারা যেন রাতের আঁধারে মুসলমানদের উপর গেরিলা হামলা চালায় এবং এর জন্য আরো দু'এক গোত্রকে নিজেদের সাথে যোগ করে নেয়। বার্তায় এটা উল্লিখিত ছিল যে, মুসলমানরা মক্কা অবরোধ করলে তারা যেন অন্যান্য গোত্র সাথে নিয়ে পশ্চাৎ হতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে।

ধৃত গোয়েন্দাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, মক্কায় যুদ্ধের প্রস্তুতি কেমন চলছে। জবাবে তারা বলে, আবু সুফিয়ান যুদ্ধের বিপক্ষে। অধিকাংশ লোক তার

অবস্থান সমর্থন করছে। ইকরামা এবং সফওয়ান কেবল লড়তে চায়। তবে তাদের সমর্থক খুব কম। তাদেরকে আবু সুফিয়ান নয়; বরং ইকরামা এবং সফওয়ান পাঠিয়েছে।

রাসূল (সা.) সেনাপতিসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে জানিয়ে দেন যে, মক্কাবাসী তাদের শহর প্রতিরক্ষায় অস্ত্রধারণ করবে-এমন মানসিকতা ও প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের মক্কায় পা রাখতে হবে। তিনি মোট সৈন্যদেরকে চার গ্রুপে ঢেলে সাজান। কারণ, তৎকালে মক্কা প্রবেশের পথ ছিল চারটি। প্রত্যেকটি পথ পাহাড় অধ্যুষিত। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি রাস্তা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। মক্কা যাওয়ার নির্দেশ হলে এ রাস্তা দিয়েই তাদের যেতে হবে।

সৈন্যদের চারটি গ্রুপে বিভক্ত করলেও একটি গ্রুপে সৈন্যসংখ্যা বেশী রাখা হয়। এ গ্রুপের নেতৃত্ব থাকে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর হাতে। রাসূল (সা.) নিজেও এ গ্রুপের সাথে ছিলেন। এক গ্রুপের কমান্ডার ছিলেন হযরত আলী (রা.)। একটি গ্রুপের হযরত যুবাইর (রা.)। আর চতুর্থ গ্রুপটির কমান্ড ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, রাসূল (সা.)-এর এই পরিকল্পনায় অসাধারণ বিচক্ষণতার বহিঃপ্রকাশ ছিল। চার রাস্তা দিয়ে মক্কা পানে এগিয়ে যাবার মূল লক্ষ্য ছিল, মক্কা প্রতিরক্ষা বাহিনীকে চার অংশে বিক্ষিপ্ত করে ফেলা। যদি তারা মুসলমানদের অগ্রযাত্রা কোন এক বা দু'রাস্তায় রোধ করে তবে অন্য গ্রুপ এগিয়ে গিয়ে শহরে ঢুকে পড়বে। এ পরিকল্পনার আরেকটি লাভ হলো, মক্কাবাসী যুদ্ধ না করলেও কোন রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যাবার উপায় ছিল না।

রাসূল (সা.) পরিকল্পনার সাথে সাথে এ নির্দেশও দেন যে, কুরাইশরা প্রতিরক্ষায় অস্ত্র হাতে এগিয়ে না এলে তাদের উপর আঘাত করা যাবে না। নিরাপত্তার জবাব নিরাপত্তার সাথেই দিতে হবে। কোথাও সংঘর্ষ বাঁধলে আহতদের হত্যা করা যাবে না; বরং তাদের চিকিৎসা ও সেবা করতে হবে। মোকাবেলায় আসার পর যারা বন্দী হবে তাদের উপর কঠোরতা করা যাবে না, তাদের হত্যা করা যাবে না, তাদেরকে যুদ্ধবন্দীও মনে করা যাবে না। এমন কি তাদের কেউ পালাতে চাইলে সে সুযোগ দিতে হবে।

সার্বিক নির্দেশনা দানের পর চার গ্রুপকে নিজ নিজ পথে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়।

॥ একশ দুই ॥

৮ম হিজরীর ২০শে রমযান। ৬৩০ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী। ইসলামী বাহিনীর তিনটি গ্রুপ নিজ নিজ রাস্তা দিয়ে এদিন মক্কায় প্রবেশ করে। এ তিন পথে চলতে মুজাহিদদের লক্ষ্যে একটি তীরও উড়ে আসে না। শহরের প্রতিরক্ষা বলতে কিছুই ছিল না। কুরাইশদের একটি তরবারীও কোষমুক্ত ছিল না। জনগণ নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করছিল। কোন কোন ঘরের ছাদে নারী, শিশুদের দাঁড়ানো দেখা যাচ্ছিল। মুসলিম বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্ক ছিল। শহরের নীরবতা সন্দেহজনক এবং ভয়াতুর ছিল। অবস্থা বলছিল, এ নীরবতা ঝড়ের পূর্বাভাস।

কিন্তু না। শহর থেকে কোন ঝড় ওঠে না। ঝড় তোলার মত লোক ছিল মাত্র দু'জন। ইকরামা এবং সফওয়ান। তারা এ সময় শহরে ছিল না। আরো কিছু লোক শহরে ছিল না। তারা নিকটবর্তী কোথাও লুকিয়ে ছিল।

এ সমস্ত লোক রাতের আঁধারে শহরের বাইরে গিয়েছিল। তাদের সাথে তীরন্দাজও ছিল। সব মিলে তারা একটি ক্ষুদ্র বাহিনীতে পরিণত হয়। যে পথে হযরত খালিদ বাহিনীর মক্কায় যাবার কথা ছিল এই ক্ষুদ্র দলটি সেই পথে এক পাহাড়ি স্থানে ওঁৎ পেতে থাকে। ইকরামা এবং সফওয়ানের জানা ছিল না যে, এ পথে এগিয়ে আসা মুসলিম দলটির কমান্ডার হযরত খালিদ (রা.)। ইকরামা এবং সফওয়ানের এক লোক পাহাড়ের উঁচুতে উঠে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল। সেই হযরত খালিদ (রা.)-কে শনাক্ত করে। লোকটি হযরত খালিদ (রা.)-কে দেখেই দৌড়ে নিচে চলে আসে।

"সফওয়ান!" লোকটি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলে—"তোমার অনুমতি পেলে তোমার স্ত্রীর ভাইকে হত্যা করতে পারি।...আমার চোখ ধোঁকা দিতে পারে না। আমি খালিদকে দেখেছি।"

"জাতির মর্যাদা ও সম্মানের সামনে আর কোনকিছুই আমার কাছে প্রিয় নয়।" সফওয়ান বলে—"যদি খালিদ আমার বোনের স্বামী হত তবুও আজ আমি স্বীয় বোনকে বিধবা করে দিতাম।"

"কে কার ভাই আজ এটা দেখার সময় নয়। কে কার স্বামী, কে কার পিতা এ প্রশ্নও আজ অনর্থক।" ইকরামা বলে—"খালিদ যদিও আমার ভাই কিন্তু সে আজ আমার শত্রু।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী আরো সামনে এগিয়ে এলে তাদের লক্ষ্যে তীরের প্রথম ঝাঁকটি ছুটে আসে। হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের থামতে বলেন।

"কুরাইশ সম্প্রদায়!" হযরত খালিদ (রা.) উচ্চকণ্ঠে বলেন—"আমার পথ ছেড়ে দিলে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। আমাদের রাসূলের নির্দেশ আছে, কেউ অস্ত্র না ধরলে তাকে কিছু না বলার।...নিজের জীবনটা তোমাদের কাছে প্রিয় নয়? আমি তোমাদের মাত্র একটি সুযোগ দিতে চাই।"

তীরের আরেকটি ঝাঁক আসে।

"আমরা তোমার রাসূলের নির্দেশ মানতে বাধ্য নই খালিদ!" ইকরামা গর্বে বলে উঠে—"সাহস থাকলে আরো এগিয়ে এস। আমরা তোমারই পুরাতন সাথী যোদ্ধা...সফওয়ান এবং ইকরামা...। তুমি জীবিত মক্কায় ঢুকতে পারবে না।"

হযরত খালিদ (রা.) তীরের দ্বিতীয় ঝাঁক থেকে শত্রুর অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম হন। হযরত খালিদ (রা.) অধীনস্থ বাহিনীকে কিছুটা পিছে সরিয়ে আনেন এবং কিছু সৈন্যকে পাহাড়ের উপর দিয়ে সামনে এগিয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করতে প্রেরণ করেন। ইকরামা এবং সফওয়ান হযরত খালিদ (রা.) কর্তৃক পাহাড়ের উপর দিয়ে প্রেরণকৃত দলটিকে দেখতে পায় না।

শত্রুর অগোচরে এই দলটি তাদের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে। নিম্নবর্তী স্থান থেকেও হযরত খালিদ (রা.) প্রচণ্ড হামলা চালান। এ হামলা এত তীব্র ও দ্রুতগতির ছিল যে, কুরাইশরা বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। হযরত খালিদ (রা.) উপর দিক থেকে আক্রমণ করান এবং নিচের দিক থেকেও। ফলে অতি সহজে এবং অতি দ্রুত কুরাইশরা পর্যুদস্ত হতে বাধ্য হয়।

"ইকরামা কোথায়?" হযরত খালিদ (রা.) আহ্বান করতে থাকেন—"সফওয়ান কোথায়?"

তারা উভয়ই ছিল লাপাত্তা। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত খালিদ (রা.)-এর আক্রমণের তীব্রতা তারা সহ্য করতে পারে না এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর চোখে পড়ার আগেই কোথাও পালিয়ে যায়। কুরাইশ সৈন্যদেরও হদিস পাওয়া যায় না। বারটি লাশ ফেলে তারা পালিয়ে যায়। সংক্ষিপ্ত এই সংঘর্ষে দু'জন মুসলমান শহীদ হন। হযরত যায়েশ বিন আশআর (রা.) এবং হযরত কুয বিন যাবির ফিহরী (রা.)।

॥ একশ তিন ॥

মুসলিম বাহিনীর তিনটি অংশ মক্কায় সেই কখন প্রবেশ করেছে। অথচ এখনও পর্যন্ত হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর কোন খবর নেই। সবাই চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। মক্কাবাসী কোনরূপ প্রতিরোধ করেনি। তাহলে হযরত খালিদ

(রা.) ও তাঁর বাহিনীর না আসার কারণ কি? এমন জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে সেনাবাহিনীর মাঝে। এক লোককে পাঠানো হয় সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশে। সে এসে জানায়, হযরত খালিদ (রা.) দু'জন মুসলমানের লাশ নিয়ে আসছেন। তার বাহিনীর হাতে কুরাইশদের বারজন নিহত হয়েছে। রাসূল (সা.) এ সংবাদ শুনে খুব রাগান্বিত হন। তিনি ভাল করেই জানতেন যে, হযরত খালিদ (রা.) যুদ্ধ-প্রেমিক। তাই তিনি মনে করেন যে, হতে পারে কোনরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই সে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে এবং উভয় পক্ষের এই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

হযরত খালিদ (রা.) মক্কায় এসে পৌঁছলে রাসূল (সা.) তাঁকে ডেকে নিয়ে কৈফিয়ত তলব করেন যে, যুদ্ধ পরিহারের সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বারজন কুরাইশকে কেন সে হত্যা করল?

হযরত খালিদ (রা.) বিনয়ের সাথে জানান যে, ইকরামা ও সফওয়ানের সাথে কুরাইশদের কিছু লোক ছিল। তারা উপর্যুপরি তীর নিক্ষেপ করে তাদের গতিরোধ করে। হযরত খালিদ (রা.) রাসূল (সা.)-কে আরো জানান যে, তিনি তাদেরকে একবার সুযোগ দিয়েছিলেন কিন্তু তারা জবাবে আরেক ঝাঁক তীর ছুঁড়ে মারে।

রাসূল (সা.) হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইকরামা এবং সফওয়ান কোথায়? হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) বলেন, তারা মক্কা প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে কোথায় যেন গিয়েছে। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর এ জবাবে রাসূল (সা.)-এর বিশ্বাস হয়ে যায় যে, হযরত খালিদ (রা.) যুদ্ধের সূচনা করেন নি; বরং আত্মরক্ষায় তাকে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হয়।

মক্কা বিজয় চূড়ান্ত পতন ঘটে মক্কার। মুসলমানদের পূর্ণ অধিকারে চলে আসে আল্লাহ্র ঘর বাইতুল্লাহ।

রাসূল (সা.) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। এ সময় হযরত উমামা বিন যায়েদ (রা.), হযরত বেলাল (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। রাসূল (সা.) মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন প্রায় সাত বছর পূর্বে। দীর্ঘ সাতটি বছর পরে নয়নভরে মক্কার চতুর্দিক দেখেন। এলাকাবাসীর প্রতি নজর করেন। দরজায় দরজায় এবং ছাদে দাঁড়ানো ঔৎসুক নারী-শিশুর প্রতি দৃষ্টি দেন। এর মাঝে অনেক মুখ ছিল চেনা, পরিচিত। তিনি চারদিক নজর বুলাতে বুলাতে সামনে এগিয়ে যান। দীর্ঘদিন পর স্বাধীনভাবে আল্লাহ্র ঘর বাইতুল্লাহ-এ প্রবেশ করেন। সাত বার কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ করেন। অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। মক্কার জনগণ ছিল নির্বাক। চোখে-মুখে ভরপুর

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। আজ তাদের বিরুদ্ধে কি নির্দেশ জারী হয় এই দুশ্চিন্তা তাদেরকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। যারা এতদিন মুসলমানদের বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছে তাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। আজ সারা মক্কায় এ দুঃসাহস কারো ছিল না যে, রাসূল (সা.)-কে জাদুকর বলবে। তাঁর প্রতি বিদ্রূপ করবে।

কুরাইশরা অস্ত্র সমর্পণের পাশাপাশি পরিণতি ভোগের জন্য ভীষণ আতঙ্কিত অবস্থায় অপেক্ষমাণ ছিল। তৎকালীন আরবে অবমাননা এবং কতলের শাস্তি বড় মর্মন্তুদ হত। রাসূল (সা.) যদিও ঘোষণা করিয়ে দিয়েছিলেন যে, যারা মুসলমানদের কিছু বলবে না তাদেরকেও কিছু বলা হবে না; তারপরেও কুরাইশদের মাঝে বিরাজ করছিল রাজ্যের ভীতি এবং আতঙ্ক।

"কুরাইশ জাতি!" রাসূল (সা.) নতশীরে দণ্ডায়মান জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন—"তোমরাই বল,আজ তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে।"

উপস্থিত সকলের কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে, তারা উত্তম আচরণ এবং ক্ষমার আশাবাদী।

"নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাও।" রাসূল (সা.) সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলেন—"তোমাদেরকে ক্ষমা করা হল।"

রাসূল (সা.)-এর জীবনের স্মরণীয় মুহূর্তের একটি হলো, বাইতুল্লায় স্থাপিত ও সংরক্ষিত মূর্তির প্রতি মনোযোগ প্রদান। কা'বা শরীফে মোট ৩৬০টি মূর্তি ছিল। এর মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রতিকৃতির ছিল একটি। এ মূর্তির হাতে তীর ছিল। মন্দিরের ধর্মযাজক এ তীরের মাধ্যমে শুভাশুভ নির্ণয় করত।

রাসূল (সা.)-এর হাতে মোটা এবং মজবুত একটি লাঠি ছিল। তিনি এ লাঠি দ্বারা মূর্তি ভাঙ্গতে শুরু করেন। এ সময় তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর রীতি অনুসরণ করেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মত তিনি মূর্তি ভাঙ্গার সময় মুখে বলতে থাকেন—"সত্য আগত মিথ্যা অপসারিত...। মিথ্যার অপসারণ অনিবার্য।" ঐতিহাসিক লেখেন, রাসূল (সা.)-এর লাঠির প্রতি আঘাতে কা'বা শরীফের চার দেয়াল থেকে যেন এই আওয়াজের ঝংকার হচ্ছিল। কা'বার অভ্যন্তর হতে মূর্তির ভগ্নাংশ উঠিয়ে বাইরে ফেলে দেয়া হয়। কা'বা চিরদিনের জন্য ইসলামী বিশ্বের ইবাদাতখানায় পরিণত হয়।

এরপর রাসূল (সা.) মক্কার ব্যবস্থাপনার প্রতি মনোনিবেশ করেন। কুরাইশ ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গোত্রের লোকও ইসলাম গ্রহণ করতে আসতে থাকে।

প্রতিমা শুধু কা'বা শরীফেই ছিল না। মক্কার আশে-পাশে অনেক এলাকায় মন্দির ছিল। সেখানেও যথাযোগ্য মর্যাদায় মূর্তি ছিল এবং মানুষ তার পূজা করত। উযযা ছিল তৎকালীন সময়ের উল্লেখযোগ্য মূর্তি। কয়েক মাইল দূরে নাখলার এক মন্দিরে এ মূর্তি ছিল। রাসূল (সা.) এ মূর্তি চূর্ণের দায়িত্ব হযরত খালিদ (রা.)-এর স্কন্ধে অর্পণ করেন। তিনি ৩০ জন অশ্বারোহী নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে রওনা হন। এভাবে অন্যান্য স্থানের মূর্তি বিনাশ করতে বিভিন্ন দল পাঠানো হয়।

উযযা কেবল একা ছিল না। সে গুরুত্বপূর্ণ দেবী হওয়ায় তার সাথে আরো অনেক ছোট দেবী ছিল। মন্দিরের সামনে পৌঁছলে পুরোহিত সামনে এসে দাঁড়ায়। মূর্তি না ভাঙ্গার জন্য সে বহু অনুনয়-বিনয় করে।

"উযযা মূর্তিটি আমাকে দেখাও।" হযরত খালিদ (রা.) খোলা তলোয়ার হাতে পুরোহিতকে নির্দেশ দেন।

পুরোহিত মৃত্যুর ভয়ে কথা না বাড়িয়ে মন্দিরের একটি সুড়ঙ্গ দ্বার দিয়ে এগিয়ে চলে। হযরত খালিদ (রা.) তার পিছু পিছু যান। এক কক্ষ পার হয়ে দ্বিতীয় কক্ষে যান। সেখানে একটি চত্বরে সুন্দরাকৃতির একটি দেবীমূর্তি ছিল। পুরোহিত মূর্তির প্রতি ইশারা করে এবং নিজে মূর্তির সামনে বিছানো কার্পেটে শুয়ে পড়ে। মন্দিরের দাসীরাও এসে যায়। হযরত খালিদ (রা.) তলোয়ারের আঘাতে সুন্দর মূর্তিটি ভেঙ্গে চুরমার করেন এবং সাথীদেরকে মূর্তির ভগ্নাংশ বাইরে নিক্ষেপ করতে বলেন।

মূর্তি ভাঙ্গায় পুরোহিত চিৎকার করে আর দাসীরা সুর তুলে কাঁদতে থাকে।

হযরত খালিদ (রা.) ছোট ছোট দেবীগুলোও চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। এরপর তিনি পুরোহিতের প্রতি গর্জন করে বলেন—"এখন তুমি তাকে দেবী বলে বিশ্বাস কর, যে নিজেকে একজন মানুষ হতে রক্ষা করতে পারে না?"

পুরোহিত হু হু করে কাঁদতেই থাকে। হযরত খালিদ (রা.) বিজয়ীর বেশে ঘোড়ায় চেপে বসেন। অন্য অশ্বারোহীদেরও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। হযরত খালিদ (রা.) ৩০ অশ্বারোহী নিয়ে মন্দির থেকে অনেক দূরে চলে গেলে ক্রন্দনরত পুরোহিত বিরাট জোরে অট্টহাসি দিয়ে ওঠে। মন্দিরের দাসীরাও হাসতে থাকে।

"উযযার অবমাননা করার স্পর্ধা কারো নেই।" পুরোহিত বিজয়ের ভঙ্গিতে বলে—"এককালের উযযার পূজারী খালিদ এই ভেবে বড় প্রসন্ন যে, সে উযযার মূর্তি গুড়িয়ে দিয়েছে।... উযযা জিন্দা। চিরদিন সে জিন্দা থাকবে।

॥ একশ চার ॥

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)!" হযরত খালিদ (রা.) ফিরে এসে রাসূল (সা.)-কে খবর দিয়ে বলেন—"আমি উযযা মূর্তি গুড়িয়ে দিয়ে এসেছি।"

"কোথায় ছিল এই মূর্তি?" রাসূল (সা.) জানতে চান।

হযরত খালিদ (রা.) ঐ মন্দির এবং তার কক্ষের বর্ণনা দেন. যেখানে তিনি মূর্তিটি দেখেন এবং পরে গুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

"তুমি উযযা মূর্তি ভাঙ্গতে পারনি খালিদ!" রাসূল (সা.) বলেন—"আবার যাও এবং আসল মূর্তি ভেঙ্গে আস।"

ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে, উযযার দু'টি মূর্তি ছিল। একটি আসল, মানুষ যার পূজা করত। দ্বিতীয়টি ছিল নকল। সম্ভবত মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার জন্য এটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

হযরত খালিদ (রা.)-এর রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। তিনি অশ্বারোহীদের নিয়ে পুনরায় নাখলায় যান। মন্দিরের পুরোহিত দূর থেকে অশ্বারোহীদের আসতে দেখে মন্দিরের পাহারাদারদের ডেকে পাঠায়।

"তারা আবার আসছে।" পুরোহিত বলে—"হয়ত কেউ তাদের বলে দিয়েছে যে, আসল মূর্তি মন্দিরে এখনও বহাল তবিয়তে আছে।...তোমরা উযযার মর্যাদা রক্ষা করবে না? এটা করলে উযযা দেবী তোমাদের ধন-সম্পদে ভরপুর করে দেবেন।"

"গুরুজী! চিন্তা করে কথা বলুন।" এক নিরাপত্তাকর্মী বলে—"এত অশ্বারোহীর মোকাবেলা আমাদের মত দু'তিনজন দ্বারা করা সম্ভব?"

"উযযা বাস্তবে দেবী হয়ে থাকলে অবশ্যই সে নিজের রক্ষা নিজে করে নিবে।" আরেক প্রহরী বলে। তার কণ্ঠ শ্লেষাত্মক ছিল। সে আরো বলে—দেব-দেবী মানুষের হেফাজত করে। মানুষ কখনও দেবতাদের হেফাজত করে না।"

"ঠিক আছে, উযযা নিজের হেফাজত নিজেই করবে।" পুরোহিত তাদের উস্কে দিতে ব্যর্থ হয়ে বলে।

হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘোড়া নিকটে এসে পড়ে। মন্দিরের নিরাপত্তাকর্মীরা পূজারীদের সাথে নিয়ে পালিয়ে যায়। পুরোহিতের বিশ্বাস ছিল, তার দেবী নিজেকে মুসলমানদের হাত থেকে অবশ্যই রক্ষা করবে। এই ভেবে সে এক তলোয়ার নিয়ে উযযার গলায় ঝুলিয়ে দেয়। পুরোহিত নিজেও মন্দিরের পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে বেরিয়ে সটকে পড়ে।

হযরত খালিদ (রা.) মন্দিরে প্রবেশ করে কক্ষে কক্ষে উযযা মূর্তি খুঁজে ফেরেন। খুঁজতে খুঁজতে একটি চমৎকার কক্ষের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। তিনি কক্ষের অভ্যন্তরে উঁকি দেন। সামনের চত্বরেই উযযার মূর্তি স্থাপিত ছিল। তার গলায় একটি তলোয়ার ঝুলছিল। হযরত খালিদ (রা.) প্রথমবার যে মূর্তিটি গুড়িয়ে দেন এটি ছিল হুবহু তার মত। এ মূর্তির পায়ের কাছে দামী আগরবাতি জ্বলছিল। কক্ষের চাকচিক্য এবং মোহিতকর সৌরভ থেকে যে কেউ বুঝতে পারে যে, এটি একটি উপাসনালয়।

হযরত খালিদ (রা.) মূর্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে থাকলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র এক লাবণ্যময়ী যুবতী তার সামনে এসে দাঁড়ায়। নগ্ন নারীটি কাঁদতে থাকে এবং মূর্তি না ভাঙ্গার জন্য অনুনয় বিনয় করে। ঐতিহাসিকের মতে হযরত খালিদ (রা.)-কে লক্ষ্যচ্যুত করতে এ নারীটি বিবস্ত্র হয়ে আসে এবং তার কাঁদার একমাত্র কারণ ছিল, হযরত খালিদ (রা.)-এর আবেগে ভাটা সৃষ্টি করা। হযরত খালিদ (রা.) নগ্ন নারীর প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে মূর্তির লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে যান। কিন্তু হতভাগ্য নারী দু'হাত ডানে-বামে প্রসারিত করে হযরত খালিদ (রা.)-এর পথ আগলে ধরে। বাধ্য হয়ে হযরত খালিদ (রা.) কোষ থেকে তলোয়ার বের করেন এবং ঐ নারীর উপর এমন জোরে আঘাত হানেন যে, এক কোপেই তার নগ্ন দেহ দু'টুকরো হয়ে দু'দিকে ছিটকে পড়ে। এরপর তিনি ক্রোধে ফেটে পড়ে মূর্তির সামনে যান এবং আঘাতে আঘাতে তাকে কয়েক টুকরো করে দেন। শক্তি এবং কল্যাণের দেবী নিজেই নিজেকে একজন মানুষ থেকে রক্ষা করতে পারে না।

হযরত খালিদ (রা.) মন্দির থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসেন এবং ঘোড়া দ্রুত ছুটিয়ে দেন। তার সাথীরাও পিছে পিছে আসতে থাকে। মক্কায় পৌঁছে হযরত খালিদ (রা.) রাসূল (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন।

"আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"আমি উযযা মূর্তি গুড়িয়ে এসেছি।"

"হ্যাঁ খালিদ!" রাসূল (সা.) বলেন—"এবার তুমি উযযার আসল মূর্তি ভেঙ্গেছ। এই এলাকায় আর কোনদিন মূর্তিপূজার চর্চা হবে না।"

॥ একশ পাঁচ ॥

কুরাইশদের প্রখ্যাত এবং হার না-মানা সেনাপতি ইকরামা মক্কার পথে হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে শেষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিল। সে এবং সফওয়ান কুরাইশ নেতার নির্দেশ অমান্য করেছিল। ইকরামা তার ভবিষ্যত বড় অন্ধকার দেখে। তার ভাল করেই জানা ছিল যে, রাসূল (সা.) তার

সদ্য অপরাধ কখনো ক্ষমা করবেন না। কেননা, সে মুসলিম বাহিনীর এক অংশের প্রতি হামলা করে তাদের দু'জন সৈন্যকে শহীদ করে দিয়েছে। ইকরামা অন্তর্ধান হলেও তার স্ত্রী মক্কায় ছিল।

ইতিহাসে পরিষ্কার লেখা আছে যে, রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের পর চার নারী এবং ছয় পুরুষের হত্যার ঘোষণা দেন। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্ত ও নীলনক্সা প্রণয়ন করেছিল। মুরতাদ বলে তাদের ঘোষণা দেয়া হয়। এই টপটেনের মধ্যে হিন্দা এবং ইকরামা ছিল শীর্ষে। হিন্দার অপরাধ ছিল ধারণারও বাইরে। কেউ মুসলমান হলেই সে তার রক্ত পানের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ত।

ইকরামার স্ত্রী মক্কায় ছিল। মক্কা বিজয়ের দু'তিন দিন পর এক ব্যক্তি ইকরামার ঘরে আসে।

"আমি তোমার জন্য আগন্তুক বোন!" লোকটি ইকরামার স্ত্রীকে বলে—"ইকরামা আমার বন্ধু। আমি বনু বকর গোত্রের লোক।...তোমার জানা আছে যে, ইকরামা এবং সফওয়ান মুসলমানদের গতিরোধ করতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের সাহায্যকারী ছিল অতি নগণ্য সংখ্যক। ঘটনাক্রমে তাদের মোকাবেলা হয় প্রখ্যাত সমরকুশলী খালিদের সাথে। আর তার বাহিনীর সংখ্যাও ছিল ঢের।"

"সবই আমি জানি।" ইকরামার স্ত্রী বলে—"সবকিছুই আমার কানে এসেছে।...আমার অপরিচিত ভাই! আমাকে বলো, সে এখন কোথায়? সে জীবিত আছে তো?

"ইয়ামান যাচ্ছে বলে সে আমাকে জানিয়েছিল।" আগন্তুক বলে—"সে যেখানেই যাক সেখানে তোমাকে ডেকে নিবে। সে কার ওখানে গেছে তাও আমি জানি। আমি তোমাকে এতটুকু জানাতে এসেছি যে, সে আর মক্কায় ফিরবে না।"

"তার এখানে না আসাই ভাল।" ইকরামার স্ত্রী বলে—"সে এলেই তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করা হবে।"

"তুমি প্রস্তুত থেকো।" আগন্তুক বলে—"তার পয়গাম এলেই আমি তোমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিব। তুমি তার কাছে গিয়ে পৌছলে সে তোমাকে সাথে নিয়ে হাবশা চলে যাবে।"

আগন্তুক নিজের নাম ও এলাকার পরিচয় দিয়ে প্রস্থান করে।

দু'দিন পর ইকরামার স্ত্রী পূর্ব লোকেশান অনুযায়ী বনু বকরের এলাকায় যায় এবং ঐ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করে যে তাকে ইকরামার সংবাদ জানিয়েছিল।

"তুমি ইকরামার কাছে যেতে এসেছো?" ইকরামার বন্ধু জিজ্ঞাসা করে।

"আমি তাকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি।" ইকরামার স্ত্রী বলে।

"তুমি কি ভুলে গেছ যে, সে এলেই তাকে হত্যা করা হবে?" লোকটি বিস্ময়ের সাথে জানতে চায়।

"তাকে হত্যা করা হবে না।" ইকরামার স্ত্রী বলে—"আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং রাসূল (সা.) আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে আমার স্বামীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

"তুমি মুহাম্মাদকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে মেনে নিয়েছ?" লোকটি বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ, মেনে নিয়েছি।" ইকরামার স্ত্রী নিঃসঙ্কোচে জবাব দেয়।

"মুহাম্মাদের সাথে হয়ত তোমার কোন চুক্তি হয়েছে।" ইকরামার বন্ধু বলে, "হয়ত সে তোমার সামনে এই শর্ত পেশ করেছে যে, তুমি আর ইকরামা ইসলাম গ্রহণ করলে...।"

"না।" ইকরামার স্ত্রী তার কথা কেটে দিয়ে বলে—"মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল। তার সাথে আমার এমন কোন চুক্তি হয়নি।...আর তিনি তাদের মত নন, যারা চুক্তি করে বশ্যতা স্বীকার করায়। আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর কাছে আমার স্বামীর দণ্ডাদেশ মওকুফের আবেদন নিয়ে গিয়েছিলাম। মুহাম্মাদ ছিল আমার অতি পরিচিত। কিন্তু এখন তাকে দেখার পর আমার মন বলে ওঠে, ইনি সেই মুহাম্মাদ নন, যিনি একদিন আমাদেরই লোক ছিলেন। মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে আমি ফরিয়াদ নিয়ে গেলে তাঁর চোখে আমি এমন দ্যুতি দেখেছি, যা সাধারণত কারো মাঝে দেখা যায় না। আমার আশঙ্কা ছিল, মুহাম্মাদ হয়ত বলবে, ইকরামার স্ত্রীকে জামানতস্বরূপ আটকে রাখ। হয়ত স্ত্রীর মায়ায় ইকরামা ফিরে আসবে নতুবা একদিন তাকেই হত্যা করা হবে। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা.) আমাকে এক অসহায় মহিলা বিবেচনা করে অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেন। আমি নিবেদন করি, আমার বাচ্চাদের ইয়াতিম করবেন না, আমার স্বামীর অন্যায় আচরণের শাস্তি আমাকে এবং আমার বাচ্চাদের দিবেন না। জবাবে তিনি বলেন, আমি ইকরামাকে মাফ করে দিলাম।...আমি আনন্দের আতিশয্যে রাসূল (সা.)-এর হাতে চুমো খাই। আমি বলতে পারি না, কোন সে অদৃশ্য শক্তি ছিল যা আমাকে এ কথা বলায় যে, "আমি অন্তঃকরণ থেকে স্বীকার করছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি ঐ খোদাকে এক বলে মেনে নিলাম যিনি মুহাম্মাদ (সা.)-কে রেসালাত দান করেছেন।"

"আর তুমি মুসলমান হয়ে গেলে?" ইকরামার বন্ধু জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ।" ইকরামার স্ত্রী বলে—"আমি তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যাই।... আমাকে তার কাছে নিয়ে চল আমার স্বামীর বন্ধু! আমি তাকে ফিরিয়ে আনব।"

"আমি অবশ্যই বন্ধুর হক আদায় করব।" ইকরামার বন্ধু বলে—"চল, আমি তোমার সাথে ইয়ামানে যাচ্ছি।"

॥ একশ ছয় ॥

অনেক দিন পর ইকরামা স্ত্রীর সাথে মক্কা প্রবেশ করে। নিজের বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে প্রথমে রাসূল (সা.)-এর কাছে যায়। বিগত দিনের সকল অপরাধের নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে ইসলাম কবুল করে।

ঠিক ঐ দিন সফওয়ানও এসে উপস্থিত হয়। সে পালিয়ে জেদ্দা পাড়ি জমিয়েছিল। তার এক বন্ধু তার ওখানে যায় এবং বুঝায় যে, সে একজন প্রখ্যাত সেনাপতি। তার কদর সম্পর্কে অবশ্যই রাসূল (সা.) অবহিত। তাকে আরো জানানো হয় যে, কুরাইশ গোত্রের অবস্থা এখন আগের মত নেই। পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।...সফওয়ান যুদ্ধপ্রিয় হলেও বিচক্ষণ ছিল। সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বন্ধুর সাথে মক্কায় ফিরে আসে এবং রাসূল (সা.)-এর সমীপে গিয়ে ইসলাম কবুল করে।

হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী হিন্দা এমন মহিলা ছিল যে, তার সম্পর্কে কারো কল্পনাও ছিল না যে, সে ইসলাম কবুল করবে। রাসূল (সা.) তার হত্যার নির্দেশ বলবৎ রেখেছিলেন। কিন্তু সে ছিল পলাতক। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দা পলাতক থাকা অবস্থায় যখন জানতে পারে যে, হযরত ইকরামা (রা.) এবং হযরত সফওয়ান (রা.)-ও ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন সে জনসম্মুখে উপস্থিত হয়। রাসূল (সা.) তাকে পেলে সোজা হত্যা করে ফেলবেন—একথা জানা থাকা সত্ত্বেও সে রাসূল (সা.)-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। রাসূল (সা.) তাকেও ক্ষমা করে দেন। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে।

মক্কার আশে-পাশে এবং দূরে-নিকটে কিছু গোত্রের অবস্থান ছিল। তাদের কতক ছিল মূর্তিপূজক আর কতক ছিল নাস্তিক। রাসূল (সা.) তাদেরকে সত্য ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানান। সৈন্যরা এ সমস্ত আহ্বান বয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদেরকে কোন প্রকার আক্রমণ না করা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়িয়ে চলতে বলা হয়।

মক্কার দক্ষিণে তিহামা অঞ্চল ছিল। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই ছিল দুর্ধর্ষ। তারা একত্রে বসবাস করত না; বরং বিক্ষিপ্তভাবে আবাস গড়ে তুলেছিল। তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা ছিল যে, হয়ত তারা মোকাবেলায় নেমে আসতে পারে। এ কারণে অত্র ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয় আর তার কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় হযরত খালিদ (রা.)-কে। সৈন্যদের সকলেই ছিল অশ্বারোহী। এ বাহিনীতে বনূ সালীম এবং মদীনা উভয়েরই লোক ছিল। মক্কা হতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে ইয়ালামলাম পর্যন্ত ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর এ সফর।

হযরত খালিদ (রা.) প্রস্তুত। প্রস্তুত খালিদ বাহিনীও। রওনা হয়ে যায় হযরত খালিদের দল। তাদের গন্তব্য ছিল ৫০ মাইল দূরে। কিন্তু ১৫ মাইল যেতে না যেতেই আরেকটি দুর্ধর্ষ গোত্র বনু যাজিমা তাঁদের গতিরোধ করে। হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদেরকে যুদ্ধের পজিশনে বিন্যস্ত করেন। বনূ যাজিমা পুরো যোদ্ধার বেশে বেরিয়ে আসে।

"আমরা লড়তে আসিনি।" হযরত খালিদ (রা.) ঘোষণা করেন—"আমরা ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতে এসেছি মাত্র।"

"আমরা ইতিপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছি।" বনু যাজিমার পক্ষ হতে জবাব আসে—"আমরা নামাযও পড়ি।"

"আমরা প্রতারণার ফাঁদে পা দিতে আসিনি।" হযরত খালিদ (রা.) উচ্চকণ্ঠে বলেন—"বাস্তবেই তোমরা মুসলমান হয়ে থাকলে তলোয়ার এবং বর্শা ফেলে দাও।"

"বনু যাজিমা; সাবধান!" বনু যাজিমার পক্ষ হতে কার গর্জন ভেসে আসে, "তাকে আমি চিনি। সে মক্কার ওলীদের পুত্র খালিদ। তার উপর আস্থা রাখা যায় না। হাতিয়ার সমর্পণ করলে সে আমাদের হত্যা করবে।...অস্ত্র সমর্পণ করবে না।"

খোদার শপথ! আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর পক্ষ হতে যুদ্ধ না করার নির্দেশ না থাকলে দেখতাম, তোমরা অস্ত্র সমর্পণ কর কি না!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমরা দোস্ত হয়ে এসেছি। আল্লাহ্‌র দ্বীন জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে আসিনি। আমাদের বন্ধু জ্ঞান কর এবং আমাদের সাথে এসে হাত মিলাও।"

"কুরাইশদের সংবাদ কি?" বনু যাজিমার পক্ষ হতে জানতে চাওয়া হয়।

"মক্কা গিয়ে দেখবে।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"আবু সুফিয়ান, ইকরামা এবং সফওয়ান ইসলাম কবুল করেছেন।"

বনূ যাজিমা অস্ত্র সমর্পণ করে। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়া হতে নেমে আসেন এবং বনু যাজিমার সর্দারের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। পুরো গোত্র ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে।

মুসলমানদের জন্য মক্কা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পরিণত হয়। এই উপমা অনেকটা ঐ সূর্যের মত যার কিরণ দূর-দিগন্তব্যাপী বিস্তৃত হতে থাকে। তবে পার্থক্য হলো, সূর্যের বিরুদ্ধে কেউ অবস্থান নেয় না। কিন্তু ইসলামের উত্থানে শত্রুশক্তি সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল।

॥ একশ সাত ॥

পবিত্র ভূমি মক্কা হতে কয়েক মাইল দূরবর্তী এলাকা 'তায়েফ'। ৮ম হিজরীর শাওয়াল মোতাবেক ৬৩০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারীর এক রাতে সেখানে নৈশ-বিনোদন চলছিল। শরাবের উৎকট গন্ধে বাতাস ভারী এবং রাত আচ্ছাদিত ছিল। নৃত্যের জন্য তায়েফের আশ-পাশ হতে সেরা সেরা নর্তকী এসেছিল। তাদের উদম নৃত্য আর রূপের ঝলক আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে মাত করে দিয়েছিল।

মক্কার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের দুর্ধর্ষ গোত্র 'হাওয়াযিন'-এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছিল এই বিনোদন অনুষ্ঠানের সম্মানিত মেহমান। তায়েফ ও আশ-পাশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থানরত গোত্র সাকীফের সর্দার ছিল এ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও আয়োজক। অতিথিবৃন্দের উপর নিজেদের ক্ষমতা, উদারতা এবং আন্তরিকতার প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশে তারা এমন জাঁকজমকপূর্ণ, আড়ম্বর এবং বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

দুই নর্তকী নৃত্য-নৈপুণ্য প্রদর্শন করছিল। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ অপলক নেত্রে দেখছিল। অতিথিগণও তন্ময় হয়ে যায়। সবাই যখন নৃত্য আর সঙ্গীতের মাঝে হারিয়ে যায় ঠিক সেই মুহূর্তে স্বাগতিক গোত্রের সর্দার মালিক বিন আওফ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। হাতে মৃদু তালি বাজায়। বাদ্যযন্ত্র নীরব হয়ে যায়। নর্তকীরা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের প্রশ্নবোধক দৃষ্টি মালিক বিন আওফের প্রতি নিবদ্ধ হয়। অতিথিবৃন্দের মাঝেও নিস্তব্ধতা নেমে আসে; সবাই নির্বাক। সরব অনুষ্ঠান মুহূর্তে নীরব হয়ে যায়। পিনপতন নীরবতা নেমে আসে মঞ্চ থেকে গ্যালারী-সর্বত্র। আকস্মিক এভাবে সবকিছু স্তিমিত হয়ে পড়ায় মনে হচ্ছিল রাতের চলমান কাফেলা যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের দৃষ্টি মালিক বিন আওফের দিকে। কোনরূপ আহ্বান কিংবা দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়াই সবাই তার দিকে চেয়ে থাকে।

মালিক বিন আওফের বয়স ৩০ বছর হবে। নৃত্য এবং মদের আসরের সে ছিল আকণ্ঠ শাহজাদা। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে গেলে তার রূপ পরিবর্তন হয়ে যেত। তখন তাকে মনে হত এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। তরবারী চালনা, তীর নিক্ষেপ এবং অশ্বারোহীতেই কেবল সে দক্ষ ছিলনা; বরং যুদ্ধ কৌশল ও সমর বিষয়েও বড় প্রজ্ঞার অধিকারী ছিল। এ সকল গুণের সুবাদেই সে গোত্রের সেনাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিল। যুদ্ধ ছিল তার অত্যন্ত প্রিয় শখ। যুদ্ধের নাম শুনলেই সে ছুটে যেতে চাইত। ঠাণ্ডা মাথায় এ বিষয়ে চিন্তা করার দেরী সহ্য হত না। তার যুদ্ধ চাল শত্রুর জন্য বড় ভয়ঙ্কর হত। কুরাইশ গোত্রে এক সময় হযরত খালিদ (রা.)-এর যে পজিশন ছিল, ঠিক তেমনি পজিশন ছিল মালিক বিন আওফের স্বীয় গোত্র মাঝে।

"আমরা প্রচুর গলাধঃকরণ করেছি।" মালিক বিন আওফ নৃত্য থামিয়ে মেজবান-মেহমান সকলকে সম্বোধন করে বলে—"আমরা মদের পাত্র শূন্য করে ফেলেছি। আমরা নৃত্যরত যুবতীদের দ্বারা চমৎকার মোহিত হয়েছি। আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এই আতিথ্য এবং এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উদযাপনের কারণ অনুধাবন করতে সম্ভব হয়েছেন?...আমি আপনাদেরকে কেবল ফুর্তির জন্য সমবেত করিনি। হাওয়াযিনের প্রিয় অতিথিবৃন্দ! আপনাদের আত্মমর্যাদাবোধ চাঙ্গা করার জন্য আমি আপনাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।"

"হাওয়াযিনের মর্যাদাবোধ মুখ থুবড়ে পড়েছিল কবে মালিক বিন আওফ?" হাওয়াযিন গোত্রের এক নেতা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে—"এসব বাদ দিয়ে বল, আমাদের মর্যাদাবোধে কে আঘাত হেনেছে?"

"মুসলমানরা!" মালিক বিন আওফ বলে—"মুহাম্মাদ এমনটি করেছে।... মুহাম্মাদ সম্পর্কে আপনারা অবগত নন? ঐ মুহাম্মাদের কথা আপনারা বেমালুম ভুলে গেছেন, যে হাতে গোনা কয়েকজন অনুসারী নিয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়াসরিবে (মদীনায়) গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল?"

"জানি, ভাল করেই চিনি তাকে" দু'তিনটি কণ্ঠ বলে ওঠে—"আমরা এটাও জানি যে, সে নিজেকে খোদার নবী বলে দাবী করত।"

"আমরা তাকে নবী মানি না।" কয়েকটি কণ্ঠ জোর দিয়ে বলে—"একান্ত কেউ নবী হলে সে ছাকীফ গোত্রের থেকে হত, হাওয়াযিন গোত্রের থেকে হত।"

"সে নবী হোক বা না হোক।" মালিক বিন আওফ বলে—"আমি আপনাদেরকে এটা জানাতে চাই, যে মক্কা থেকে একদিন মুহাম্মাদ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, সে মক্কার বর্তমান শাসক সেই।

সারা মক্কায় এখন তার শাসন চলছে। তার সমরশক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুরাইশরা তার সামনে অস্ত্র সমর্পণ করেছে। প্রায় সকলেই তার ধর্ম মেনে নিচ্ছে। আবু সুফিয়ান ইকরামা এবং সফওয়ানের মত প্রখ্যাত যোদ্ধা মুহাম্মাদের ধর্ম মেনে নিয়েছে। খালিদ বিন ওলীদ তো অনেক আগেই এই নয়া ধর্মমতের অনুসারী হয়ে গেছে।...মুসলমান মক্কা বিজয় করে সমস্ত মূর্তি গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে।"

"কুরাইশদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বীয় ধর্মের প্রতি টান থাকলে তারা হুড়মুড় করে আত্মসর্পণ নয়, বরং বীর বিক্রমে লড়ে আত্মাহুতি দিত।" আরেকজন মন্তব্য করে।

"এখন তারকাভরা আকাশ চেয়ে চেয়ে দেখবে যে, হাওয়াযিন এবং ছাকীফ গোত্রে আত্মমর্যাদাবোধ কেমন লৌহবৎ।" মালিক বিন আওফ বলে।

"আমাদের কেউ মুহাম্মাদের জীবন সংহার করুক, এটাই কি তোমার অভিলাষ?" হাওয়াযিন গোত্রের এক সর্দারের প্রশ্নযুক্ত উক্তি—"তোমার বক্তব্যের সারমর্ম যদি এটাই হয়ে থাকে তবে এ দায়িত্ব নির্দ্বিধায় আমার কাঁধে অর্পণ করতে পার।"

"এখন মুহাম্মাদকে হত্যা করায় কোন লাভ হবে না।" মালিক বিন আওফ বলে—"তাকে হত্যা করলে তাঁর অনুসারী ও ভক্তরা তাঁকে নিজেদের অন্তরে ধারণ করে রাখবে। তাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এখন একজনকে হত্যা করার দ্বারা তারা ঐ পথ পরিহার করবে না, যে পথে তাদের নিক্ষেপ করা হয়েছে।"

"শোনা যায় মুহাম্মাদের হাতে নাকি জাদু এসে গেছে।" হাওয়াযিন গোত্রের এক সর্দার বলে—"সে যার দিকে চায়, সেই তার ভক্ত হয়ে যায়।"

"যেখানে তলোয়ার চলে সেখানে জাদুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না।" হাওয়াযিন গোত্রের আরেক সর্দার নিজের তরবারীর হাতলে হাত রেখে বলে—"মালিক! তোমার পরিকল্পনা খুলে বল। আমরা তোমার সাথে আছি।"

"আমি বলতে চাচ্ছি, সম্মিলিতভাবে আমরা যদি মুহাম্মাদের ইসলাম প্রতিহত না করি তবে তা প্লাবনের মত বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং একদিন এ প্লাবন আমাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।" মালিক বিন আওফ বলে—"সেদিন হাওয়াযিন বলতে কেউ থাকবে না, বনু ছাকীফেরও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। কুরাইশ গোত্রকে যারা জোরপূর্বক প্রজা ও জিম্মী বানিয়ে রেখেছে আমরা তাদেরকে মক্কার অভ্যন্তরেই শেষ করে দিব।...জিম্মী হওয়ার অর্থ আপনারা বুঝতে পেরেছেন?"

মালিক বিন আওফ সকলের প্রতি চোখ বুলিয়ে বলে, "না বুঝলে আমি আপনাদের বলছি।"—এরপর চকিতে পিছনে ফিরে তাকায়।

মালিক বিন আওফের পিছনের সারিতে মেহমানদের মাঝে শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত এক অশীতিপর বসা ছিল। তার গায়ের রং অন্যদের তুলনায় ধবধবে ও শুভ্রাচ্ছাদিত ছিল। অতিশয় দুর্বলতার কারণে তার মাথা কাঁপছিল এবং কোমরে বক্রতার হাল্কা ছাঁপ ছিল। তার হাতে শরীর বরাবর লম্বা লাঠি ছিল। দেহে চাপানো ছিল লম্বা জুব্বা, যা কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত প্রসারিত। সব মিলিয়ে উপস্থিত দর্শকের চোখে সে ছিল প্রাজ্ঞ কোন পণ্ডিত নতুবা ধর্মগুরু। মালিক বিন আওফের ইঙ্গিতে সে আসন ছেড়ে উঠে মালিকের কাছে এসে দাঁড়ায়।

"স্রষ্টার রহমত বর্ষিত হোক তোমার প্রতি" বৃদ্ধ বলে—"যে দেবতার আরাধনা তুমি কর তিনি তোমার সন্তান-সন্ততির হেফাজত করুন। জিম্মী এবং দাসত্বের তাৎপর্য না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞাসা কর। আমার চার যুবতী কন্যা আজ মুসলমানদের বাঁদী। দু'যুবক পুত্র মুসলমানদের গোলাম-দাস। তারা তরবারী চালনা এবং অশ্বারোহীতে দক্ষ ছিল। কিন্তু তাদের তরবারী স্পর্শ করা এবং ঘোড়ার ধারে কাছে যাওয়ার অনুমতি নেই। আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে...।

তোমরা মনে হয় ভুলে গেছ, কুরাইশরা মদীনা অবরোধ করলে মুসলমানরা প্রতিরক্ষায় শহরের চতুর্দিকে পরিখা খনন করেছিল। কুরাইশদের পক্ষে সে পরিখা অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। এরপর প্রলয়ংকরী তুফান ও আবহাওয়া বিপর্যয়ের দরুন প্রথম থেকেই হীনতার শিকার কুরাইশ সৈন্যের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায় এবং তারা মক্কায় ফিরে এসে পড়েছিল। মুসলমানদের মাথার উপর থেকে বিপদের কালো মেঘ সরে গেলে তারা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে মদীনায় দীর্ঘদিন যাবত নিরাপত্তার সাথে অবস্থানরত ইহুদী বসতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ইহুদীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করে এবং তাদের নারী-শিশুদেরকে নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নিয়ে তাদেরকে বাদী ও গোলামের শৃঙ্খলে চির আবদ্ধ করে।"

"জনাব!" ছাকীফ গোত্রের এক সর্দার জোরাল কণ্ঠে বলে—"আপনার কথাবার্তায় স্পষ্ট হয়, আপনি ইহুদী। আচ্ছা বলুন তো, আপনার ইহুদী গোত্র সে সময় মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করেছিল বলে যে কথা আমরা শুনেছিলাম তা কি সত্য নয়?"

"হ্যাঁ, যা শুনেছ তার সবই সত্য।" বৃদ্ধ বলে—"আমাদের প্রতারণা নিষ্ফল হয়। আমরা পশ্চাৎ হতে মুসলমানদের পিঠে খঞ্জর বসাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই কুরাইশরা রণে ভঙ্গ দেয়। প্রতারণার ফাঁদে ফেলে মুসলমানদের দুর্বল করে তোলা আমাদের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তাদের তলোয়ার বড় ধারালো। আমাদের সকল ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা কেটে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।"

"আপনার গোত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে আপনি আমাদের উত্তেজিত করতে এসেছেন, মাননীয় ইহুদী?" ছাকীফ গোত্রের আরেক নেতার স্পষ্টবাদী প্রশ্ন।

এ সময় আরেক বয়োবৃদ্ধ আসন ছেড়ে দাঁড়ায়। দুরায়দ বিন ছম্মাহ তার নাম। ইতিহাসে তার নাম পাওয়া গেলেও গোত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে, সে ইহুদী ছিল না। হাওয়াযিন বা ছাকীফ গোত্রের লোক ছিল।

"চুপ কর।" দুরায়দ বিন ছম্মাহ গর্জে উঠে বলে—"আমরা বনী ইসরাঈলের রক্তের প্রতিশোধ নিব না। এখনও তোমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলাচলে নিপতিত? সংশয়-সন্দেহের আবর্তে নিক্ষিপ্ত? এ বাস্তবতা অনুধাবনের সময় কি এখনও হয়নি যে, মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে আমরা যদি আজ তাদের রক্ত আমাদের তলোয়ারকে পান না করাই এবং তাদের আহতদেরকে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট না করি, তবে সেদিন দূরে নয় যেদিন তারা আমাদের হত্যা করে কন্যা, বোন ও স্ত্রীদেরকে বাঁদী এবং পুত্রদেরকে গোলামে পরিণত করবে।"

"তাদের ঘোড়া তায়েফের অলি-গলিতে চিঁহি চিঁহি রবে প্রদক্ষিণ করার পূর্বেই কি এটা সমীচীন নয় যে, আমাদের ঘোড়া তাদের লাশ মক্কার অলি-গলিতে পিষ্ট করুক?" মালিক বিন আওফ আবেগ তাড়িত কণ্ঠে বলে—"বনী ইসরাঈলের এই ভদ্রলোক আমাদের নিরাপত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তিনি স্বীয় গোত্রের যে পরিণতি বর্ণনা করেছেন আমি আপনাদেরকে ঐ মর্মান্তিক পরিণতি হতে রক্ষা করতে চাই।...চল, লাত দেবীর নামে দৃপ্ত শপথ করি যে, মক্কার মূর্তিবিনাশী মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীদের বিনাশ করে তবেই আমরা স্ত্রীদের কাছে যাব এবং তাদেরকে আমাদের মুখ দেখাব।"

॥ একশ আট ॥

ইসলাম রবির কিরণ যখন চতুর্দিকে বিস্তৃত হচ্ছিল তখন আরব ভূখণ্ডে মন্দিরের রামরাজত্ব ছিল। ব্যাপকভাবে মূর্তিপূজা ও প্রতিমা অর্চনা হত। উপাস্য নির্বাচনের প্রশ্নে দল-মত-গোত্র-বর্ণে বিভিন্নতা থাকলেও উপাসনার প্রশ্নে সবাই

ছিল এক ও অভিন্ন। পূজা-অর্চনার ব্যাপক চর্চা চললেও সকলেই আবার আস্তিক ছিল। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে তাদের বিশ্বাস ছিল। তাদের দোষ ছিল, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে তারা মাঝখানে ভায়া হিসেবে বিভিন্ন কল্পিত মূর্তি-প্রতিমার অস্তিত্ব টেনে আনত। তাদের বিশ্বাস ছিল, এ সমস্ত মূর্তির সন্তোষ অর্জন ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব নয়। মূর্তির মন জয় করতে তারা কিছু প্রথার ব্যবস্থা করেছিল। তায়েফে উপযাচিত ও পূজার্হ মূর্তির নাম ছিল 'লাত'। এটা কোন মানব বা দানবাকৃতি ছিল না। এটা ছিল মূলত বিরাটাকৃতির একটি পাথর। যাকে একটি প্রান্তরও বলা যেতে পারে। এই প্রান্তভাগটি চতুর্ভুজের মত ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মত, এই পাথরটি প্রাকৃতিকভাবে একটি বিশাল চত্বরের মত পড়ে ছিল। হয়ত কোনকালে এখানে কেউ কোন মূর্তি স্থাপন করেছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবকালে এটা মূর্তিশূন্য ফাঁকা চত্বর ছিল। আশে-পাশের লোকেরা এই চত্বরেরই পূজা করত।

৬৩০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের যে রাতে হাওয়াযিন গোত্রের নেতৃবৃন্দ ছাকীফ গোত্রের অতিথি হয়ে তায়েফে এসেছিল এবং এক পর্যায়ে মালিক বিন আওফ ও দুরায়দ বিন ছম্মাহ তাদেরকে মক্কা আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করছিল তখন হাওয়াযিনের এক নেতা প্রস্তাব রাখে যে, জ্যোতিষী ডেকে ভাগ্য গণনা করা হোক। আমাদের আক্রমণ সফল হবে কি-না তা আগে পরীক্ষা করা উচিত। ভাগ্য নির্ধারক শরের মাধ্যমে এই ফলাফল নির্ণয় করা হত। মূর্তির হাতে একটি থলে থাকত। তাতে অনেকগুলো তীর ছিল। কিছু 'হা' আর কিছু 'না' চিহ্নিত। কোন পুরোহিত বা জ্যোতিষী ঐ তূণীর থেকে একটি তীর টেনে বের করত। দেখা হত এটা কোন্ চিহ্নবিশিষ্ট। 'হা' না-কি 'না'। যাই বের হত না কেন সেটাই ছিল ফলাফল; ভাল-মন্দ নির্ণয়।

ভাগ্য নির্ণয়ের প্রশ্নে পুরোহিতের তুলনায় জ্যোতিষীর মান ছিল বেশী। জ্যোতিষী জ্ঞানী-বিচক্ষণ হত। সহজে অভিভূত এবং হৃদয় জয় করার অনেক দুর্বোধ্য মন্ত্র তাদের জানা থাকত। তাদের বাকপটুত্ব এবং বাচনভঙ্গি যে কাউকে নিমিষে ভক্ত বানিয়ে দিত। জ্যোতিষী ভাগ্য নির্ণয় ছাড়াও গায়েবী খবর জানত। মানুষ তাদের প্রতিটি কথা সত্য মনে করে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত।

পরদিন প্রভাতে হাওয়াযিন এবং ছাকীফ গোত্রের দু' শীর্ষ নেতা জনৈক জ্যোতিষজ্ঞের সামনে বসা ছিল। তারা কোন কথা বলার পূর্বেই জ্যোতিষী কথা বলে ওঠে।

"আমি যখন গায়েবের খবর দিতে পারি এবং ভবিষ্যতের মাঝে ডুব দিয়ে বলতে পারি যে, ভবিষ্যত কেমন হবে এবং তাতে কি কি ঘটবে তখন তোমাদের

অন্তরে কি আছে তা বলতে পারব না?" জ্যোতিষী চোখ না খুলেই বলে—"তোমরা মুখ বন্ধ রেখে আমার মুখে শোন, তোমরা কি বলতে এসেছ।... তোমরা যাদের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছ তাদেরকে এক প্রকার ঘুমন্ত মনে করতে পার। তারা মক্কা অধিকার করে এখন তার শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। তারা মক্কায় কর্তৃত্বের ভিত্তি মজবুত করছে। মক্কায় এখনও তাদের দুশমন আছে। সবাই মুহাম্মাদের ধর্ম মেনে নেয়নি।"

"সম্মানিত জ্যোতিষী!" দুরায়দ বিন ছম্মাহ বলে—"আপনি অনুগ্রহপূর্বক বলুন, মুহাম্মাদের অগোচরে আমরা তাকে কাবু করতে পারব কি-না? আমাদের অতর্কিত আক্রমণ মুসলমানদের কোমর গুড়িয়ে দেবে কি-না?"

জ্যোতিষী আকাশ পানে চায় এবং কিছুক্ষণ দুর্বোধ্য ভাষায় মন্ত্র পড়ে বলে—"ভবিষ্যতের পর্দা চিরে দেখলাম।...তোমাদের হামলা অতর্কিতে হবে। তোমাদের তলোয়ার যখন তাদের কচুকাটা করতে থাকবে ঠিক তখনই তারা টের পাবে; এর আগে নয়। শাহরগ স্পর্শিত তলোয়ারের ক্রোধ থেকে সরে কে নিজেকে রক্ষা করতে পারে?...এটাই মোক্ষম সময়, এটাই অপূর্ব সুযোগ। মুসলমানরা একবার নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারলে তোমাদের চাওয়া আর পূর্ণ হবে না। তখন মুসলমানরাই তোমাদের পিছু ধাওয়া করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ এবং নারীদেরকে তোমাদের লাশের উপর দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবে।...এখন শুভাশুভ যাচাইয়ের আর প্রয়োজন নেই। 'লাত' দেবী নিজেই হামলার স্বপক্ষে ইঙ্গিত দিয়েছে এবং জিজ্ঞাসা করেছে, আমার পূজারীদের তলোয়ার এখনও কোষাবদ্ধ কেন?"

"কোন নজরানা লাগবে?" এক সর্দার জিজ্ঞাসা করে।

"হাম।" জ্যোতিষী বলে, "তোমাদের কাছে 'হাম' থাকলে তা নজরানা হিসেবে দাও। আর না থাকলে প্রয়োজন নেই। তবে স্বীয় গোত্রকে জোর দিয়ে বলবে, তারা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে। এ লড়াইয়ে রক্ত এবং প্রাণ কুরবান করতে হবে।...হামের খোঁজে সময় অপচয় করো না।...যাও, আমি তোমাদের সবকিছু জানিয়ে দিলাম। মক্কায় মুসলমানরা অন্য কাজে ব্যস্ত। তারা এখন রণসাজে সজ্জিত নয়। এটা অপূর্ব সুযোগ। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। সুযোগ একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে তখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।"

যে উটের বংশধারা চতুর্থ স্তরে উন্নীত হয় তাকে 'হাম' বলে। তৎকালে মানুষ এ ধরনের উট মূর্তির নামে ছেড়ে দিত। এ উটকে 'পবিত্র' মনে করে কেউ

তাকে বাহন কিংবা অন্য কাজে ব্যবহার করত না। সাংকেতিক চিহ্ন থাকত এদের দেহে অঙ্কিত। এ শ্রেণীর উট যার সামনেই পড়ত সে তাকে সম্মান করত এবং উত্তম খাদ্যযোগে তাকে আপ্যায়িত করত।

হাওয়াযিন এবং ছাকীফ গোত্রের শীর্ষনেতা জ্যোতিষীর আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেলে জ্যোতিষী অন্তপুরে চলে যায়। সেখানে ঐ ইহুদী বসা ছিল, গতকাল প্রীতিভোজানুষ্ঠান চলাকালে মালিক বিন আওফ যাকে ইঙ্গিতে বলেছিল যে, সে যেন সবাইকে দাসত্ব ও জিম্মী হয়ে থাকার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়।

"আমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছি।" জ্যোতিষী ঐ ইহুদীকে বলে—"এরা মক্কায় রওনা হতে আর দেরী করবে না।"

"তারা কি সফল হতে পারবে?" বৃদ্ধ ইহুদী জানতে চায়।

"বীরত্ব এবং বিচক্ষণতার মধ্যে সফলতা নিহিত।" জ্যোতিষী বলে, "যদি তারা শুধুমাত্র আবেগের উপর ভর করে লড়াই করে এবং বিচক্ষণতার পরিচয় না দেয়, তবে মুহাম্মাদের সুশিক্ষিত সৈনিকেরা তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করবে।...আমার পুরস্কার কই?"

"তোমার পুরস্কার সাথে করেই এনেছি।" বৃদ্ধ ইহুদী এ কথা বলে কাউকে ডাক দেয়।

অপর কামরা হতে এক সুন্দরী নারীর আবির্ভাব ঘটে। বৃদ্ধ ইহুদী তার জোব্বার পকেটে হাত দিয়ে দু'টি স্বর্ণের টুকরো বের করে এনে জ্যোতিষীকে দেয়।

"আমি কাল সকালে এসে এই যুবতীকে নিয়ে যাব।" বৃদ্ধ ইহুদী বলে।

"আমি তোমাকে একটি কথা বলে দিতে চাই।" জ্যোতিষী বলে, "আমি তোমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাদেরকে এখনই মক্কা আক্রমণ করতে উস্কে দিয়েছি। কিন্তু তাদের নেতারা বেশ অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ। তারা পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। তাদের বৃদ্ধ সর্দার দুরায়দ বিন ছম্মাহ পূর্ব হতেই অবগত যে, মুসলমানরা মক্কায় এখনও সবকিছু সামাল দিতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিধানসহ অনেক কাজ এখনও তাদের সামনে পড়ে আছে। তাদের উপর আক্রমণের এটাই উপযুক্ত সময়। হাওয়াযিন এবং ছাকীফ গোত্রের শীর্ষনেতারা এ বিষয়ের সত্যতা যাচাই করতে আমার কাছে এসেছিল। খুব ভাল হয়েছে যে, তাদের আসার পূর্বেই তুমি গোপনে আমার কাছে এসে সবকিছু অবগত করিয়েছ।"

"আমার একমাত্র লক্ষ্য মুসলমানদের বিনাশ।" বৃদ্ধ ইহুদী বলে।

॥ একশ নয় ॥

ঐতিহাসিক লেখেন, হাওয়াযিন এবং ছাকীফ শক্তিশালী দু'টি গোত্র ছিল। মুসলমানরা মক্কা বিজয় করলে তাদের আশঙ্কা হয় যে, তারা পৃথক পৃথক এলাকায় থাকে এবং বসতি এলাকার সংখ্যাও অনেক। তারা এক স্থানে থাকে না; বহু দূরে দূরে আবাস তাদের। মুসলমানরা প্রত্যেক এলাকা দখল করে তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। নিজেদের ভবিষ্যত তমসাচ্ছন্ন দেখে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বিভিন্ন গোত্রকে এক প্লাটফর্মে এনে সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

উভয় গোত্র যুদ্ধ-সক্ষম লোকদের নিয়ে হুনাইনের নিকটবর্তী আওতাস নামক স্থানে যায়। মুসলমানরা তাদের বসতির উপর আক্রমণ করে তাদের সমূলে বিনাশ করছে—একথা বলে তাদের নেতারা আশেপাশের আরো কয়েক গোত্রকে নিজেদের সাথে একাকার করে নেয়। সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ হাজার। এই সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয় মালিক বিন আওফ। তার অনুমতি ছিল, কেউ চাইলে তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যাসহ গৃহপালিত পশুও সাথে নিয়ে যেতে পারে। এই অনুমতির পিছনে তার এই যুক্তি ছিল যে, মক্কার অবরোধ দীর্ঘ হতে পারে। ফলে এ সময় সৈন্যদের স্ত্রী, পুত্র ও পালিত পশুর ব্যাপারে চিন্তা হতে পারে যে, তারা কেমন আছে, কি করছে ইত্যাদি। এই ঢালাও অনুমতি হতে প্রায় সকলেই ফায়দা উঠায়। এর ফলে সৈন্যদের তুলনায় তাদের স্ত্রী, সন্তানের সংখ্যা ছিল কয়েকগুণ বেশী। উটও ছিল অগণিত।

দুরায়দ বিন ছম্মাহ অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সামর্থ্য তার ছিল না। কিন্তু সৈন্যদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে সময়মত লড়ানোর যোগ্যতা তার মত আর কারো ছিল না। সর্বাধিনায়ক ছিল মালিক বিন আওফ। তার বড় গুণ হল তার আবেগ ছিল অস্বাভাবিক। দুরায়দকে সাথে করে আনা হয় তার অভিজ্ঞতার কারণে।

সৈন্যরা যখন আওতাসে এসে অবস্থান করে দুরায়দ বিন ছম্মাহ তখন এসে সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়। তখন বেলা অপরাহ্ন। সন্ধ্যা সমাগম। সেনা ছাউনিতে পা দিতেই তার কানে ভেসে আসে ছোট ছোট বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ এবং বকরী, গাধার সন্ধ্যাকালীন ডাক। সে একজনের কাছে জানতে চায়, সৈন্যদের সাথে ছোট বাচ্চা এবং বকরী-গাধা কে নিয়ে এসেছে? তখন তাকে জানানো হয় যে, পরিবার-পরিজন এবং চতুষ্পদ জন্তু সাথে নিয়ে আসতে সেনাপতি কেবল অনুমতিই দেয়নি; বরং এ ব্যাপারে বেশ উৎসাহিতও করেছে।

"মালিক!" দুরায়দ বিন ছুম্মাহ মালিক বিন আওফের তাঁবুতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে "এটা তুমি কি করলে? এমন সেনাবাহিনী আমার দৃষ্টিতে এই প্রথম, সেনাবাহিনীর পরিবর্তে যাদেরকে আবাস পরিবর্তনকারী কাফেলা বলে মনে হচ্ছে।"

"জনাব! আপনার যুদ্ধ বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।" মালিক বিন আওফ বলে—"কিন্তু আমার মাথায় যে পরিকল্পনা এসেছে তা সারাজীবন আপনার কল্পনায় আসেনি। আমি সৈন্যদের এটা বুঝিয়েছি যে, অবরোধ দীর্ঘ হতে পারে। ফলে তখন যেন স্ত্রী-পরিজন ও চতুষ্পদ জন্তুর কথা মনে না পড়ে তার জন্য এদের সাথে আনতে বলেছি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন। আমি মক্কা অবরোধ করে রাখব না। গিয়েই আক্রমণ শুরু করব। মুসলমানদের অজান্তে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। কিন্তু তারপরেও আপনি জানেন যে, মুসলমানরা অত্যন্ত সুকৌশলী এবং বিচক্ষণ। তারা বিচিত্র কৌশলে লড়তে থাকবে। আমাদের সৈন্যরা তাদের বীরত্ব এবং চালের সামনে নাও টিকতে পারে। কিন্তু যখন তাদের মনে পড়বে এবং চোখের সামনে দেখবে যে, যে স্ত্রী, পুত্র, স্বজন এবং পশু-প্রাণীর মায়ায় জীবন বাঁচাতে পালাব, আমাদের পলায়নে তাদের জীবন ধ্বংসের সম্মুখীন হবে তখন তারা পলায়নের চিন্তা মাথা হতে ঝেড়ে-মুছে ফেলে জীবন বাজি রেখে বিপুল বীর বিক্রমে লড়াই করবে।"

"অভিজ্ঞতা বয়সের দ্বারা অর্জিত হয় মালিক!" দুরায়দ বলে, "তোমার মাঝে প্রেরণা আছে। আছে আত্মমর্যাদাবোধ এবং সাহসিকতা। কিন্তু বুদ্ধি তোমার এখনও অপরিপক্ক। পরিবার-পরিজনের কারণে সৈন্যদের মনোযোগ এখন সামনে নয়, পিছে থাকবে। সর্বদা এই উদ্বেগ তাদের মাঝে বিরাজ করবে যে, শত্রুরা পশ্চাৎ দিক হতে তাদের স্ত্রী-সন্তানদের উপর আক্রমণ করল না তো! শত্রুরা সৈন্যদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালালে তারা দ্রুত স্ত্রী-পরিজনের কাছে এসে দাঁড়াবে, যেন অন্তত তারা শত্রুদের থেকে নিরাপদ থাকুক।...এক বিরাট দুর্বলতা তুমি সাথে করে এনেছ। মুহাম্মাদের জঙ্গী-নেতৃত্বের ধারণা তোমার নেই, আমার আছে। তার অধীনে প্রখ্যাত এবং নামকরা সেনাপতিরা আছে। তারা অল্প সময়ে আমাদের দুর্বলতা টের পেয়ে এই দুর্বল পয়েন্টে আঘাত হানবে। তারা সৈন্যদের চেয়ে স্ত্রী-সন্তান ও চতুষ্পদ জন্তুর উপর আক্রমণ করতে বারবার চেষ্টা করবে। তাদের সাথে না নিয়ে এখানে রেখে যাও আর শুধু সৈন্যদের নিয়ে মক্কায় রওনা হও।"

"সম্মানিত শায়েখ!" মালিক বিন আওফ বলে—"আপনার এ অভিজ্ঞতা ও আশঙ্কা সেকেলে। বয়সের ভারে একদিকে আপনার অভিজ্ঞতা প্রচুর হলেও

অন্যদিকে বোধশক্তিতে ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। সেনাপতি যেহেতু আমি তাই নির্দেশ চলবে আমারই। কোথাও প্রয়োজন মনে করলে আপনাকে ডেকে পরামর্শ চাইব। আপনি এখন আসতে পারেন।"

ঐতিহাসিক লেখেন, মালিক বিন আওফ দুরায়দের পরামর্শ গ্রহণ না করে বরং উল্টো তাকে অপমান করার প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা দুরায়দের ছিল। মালিকের কাছে তার কথার গুরুত্ব না থাকলেও অন্যদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। কিন্তু তিনি শুধু এই কারণে চুপ করে যান যে, এখন নিজেদের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় নয়।

"সৈন্যদের ব্যাপারে আপনার অন্য কোন পরামর্শ থাকলে বলতে পারেন।" মালিক বিন আওফ দুরায়দকে বলে।

"আমার যা করণীয় তা তোমাকে জানানো ছাড়াই আমি করব।" দুরায়দ বলে—"আমার মধ্যে যদিও লড়ার শক্তি নেই কিন্তু অন্যদের লড়াতে পারি।"

এরপর দুরায়দ নিজ তাঁবুতে ফিরে গিয়ে বিভিন্ন গোত্রের নেতাদে ডেকে পাঠায়। তারা সমবেত হলে তাদের উদ্দেশে শুধু এতটুকু বলে যে—"আক্রমণ সংঘবদ্ধ হয়ে করবে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। সমস্ত সৈন্যকে জানিয়ে দেবে, যুদ্ধের পূর্বেই যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ তলোয়ারের খাপ (কোষ) ভেঙ্গে-চুরে ফেলে দেয়।"

তৎকালীন আরবের নিয়ম ছিল, যুদ্ধে তলোয়ারের কোষ ভেঙ্গে ফেললে তার অর্থ ছিল, লোকটি লড়তে লড়তে প্রাণ দিবে; পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। পরাজিত হবে না। তলোয়ারের কোষ ভেঙ্গে ফেলাকে বিজয় বা মৃত্যুর ঘোষণা বলে মনে করা হত।

কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না যে, দুরায়দ গোত্রপতিদের ডেকে স্ত্রী-পরিজন ও চতুষ্পদ জন্তু আওতাসে রেখে শুধু সৈন্যদের মক্কা যেতে বলে। তবে দু'জন ঐতিহাসিকের মত হল, মূল যুদ্ধের সময় কেবল হাওয়াযিন গোত্রের স্ত্রী , পুত্র ও চতুষ্পদ জন্তু সাথে ছিল।

॥ একশ দশ ॥

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক গোত্রের এক জোট হওয়ার এটা ছিল দ্বিতীয় ঘটনা। প্রথমবার খন্দক যুদ্ধে এমন অধিক গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে জড়ো হয়েছিল। মালিক বিন আওফ এবার এই আশায় সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে রওনা হয় যে, তারা অতর্কিতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তার বাহিনীর এতদিন মক্কায়

চলে যাওয়ার কথা ছিল। চলার গতিও হতে হত বেশ দ্রুতগামী। কিন্তু অন্যান্য গোত্রের এখানে (আওতাসে) এসে মূল বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার কথা থাকায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের এখানে দেরী হয়ে যায়।

শুধু সৈন্য থাকলেও তারা এতদিন রওনা হতে পারত। কিন্তু সৈন্যসংখ্যার চেয়ে স্ত্রী-পুত্র, পরিজন এবং চতুষ্পদ জন্তু ও তাদের গৃহস্থালী আসবাবপত্র অধিক থাকায় আওতাস হতে তাদের রওনা হতে অনেক দেরী হয়। এ সময় মক্কার অলিতে-গলিতে একটি আওয়াজ সকলকে চমকে দেয়।

"মুসলমান! হুশিয়ার...প্রস্তুত হও।" এক উষ্ট্রারোহী রাসূল (সা.)-এর বাসভবনের দিকে যেতে যেতে এই আহ্বান করছিল—"আল্লাহ্‌র কসম! যা আমি নিজ চোখে দেখেছি, তা তোমাদের কারো চোখ দেখেনি।"

"কি হৈ-চৈ করে ফিরছ?" একজন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে—"থাম, ঠাণ্ডা হয়ে বল, কি দেখে এসেছ?"

"রাসূল (সা.)-কে বলব।" লোকটি না থেমে যেতে যেতে বলে—"প্রস্তুত হও।...হাওয়াযিন এবং ছাকীফের সৈন্যরা... ।"

রাসূল (সা.) বিস্তারিত তথ্য লাভ করেন যে, হাওয়াযিন এবং ছাকীফ গোত্রের সাথের অন্যান্য গোত্রের হাজার-হাজার লোক আওতাসের কাছে তাঁবু ফেলে আছে। তাদের উদ্দেশ্য মক্কা আক্রমণ করা এবং তারা রওনা করার উপক্রম। ইতিহাসে ঐ ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না, আওতাসের এই সম্মিলিত বাহিনী সর্বপ্রথম যার চোখে পড়ে এবং যে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়। ঐতিহাসিকদের বর্ণনাধারায় শুধু এতটুকু জানা যায় যে, অমুসলিমদের এই বহুজাতিক বাহিনীর সমবেত হওয়ার কথা রাসূল (সা.) পূর্বেই অবগত হয়ে যান।

এ সমস্ত ঐতিহাসিক এবং পরবর্তী বিশ্লেষকদের মতে, রাসূল (সা.)-এর ইচ্ছা ও চেষ্টা এটাই ছিল, যে কোন উপায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিহার করা এবং যে সমস্ত অমুসলিম শক্তি মুসলমানদেরকে শত্রু মনে করে এবং রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাদের প্রতি সহমর্মিতা, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের পয়গাম প্রেরণ করা।

একদিকে এই ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা আর অপরদিকে ৬৩০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নবী করীম (সা.) যুদ্ধে যাওয়ার মত অবস্থায় ছিলেন না। মক্কার আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন। রাসূল (সা.)-কে পরামর্শ দেয়া হয় যে, শহরের পুনর্গঠন আপাতত স্থগিত রেখে শহরের প্রতিরক্ষার দিকে

দৃষ্টি দেয়া দরকার। সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত কিংবা অবরোধের অপেক্ষা করা উচিত।

রাসূল (সা.) পরামর্শদাতাদের পরামর্শ এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, আমরা এখানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বসে থাকলে যখন শত্রুপক্ষ টের পাবে যে, আমরা সতর্ক এবং কেল্লা বন্ধ করে বসে আছি, তখন দুশমন মক্কা থেকে কিছু দূরে তাঁবু গেড়ে এই অপেক্ষায় বসে থাকবে যে, আমরা প্রতিরক্ষায় বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করি আর তারা এই সুযোগে শহর অবরোধ করে ফেলবে অথবা একযোগে এসে আক্রমণ করবে। এটা খাল কেটে কুমির আনার মতই বিপজ্জনক হবে। কেননা তারা তখন আমাদের জন্য সার্বক্ষণিক বিপদের কারণ হয়ে রবে।

তৎকালীন যুগের উদ্ধারকৃত বিভিন্ন দলীল হতে জানা যায় যে, রাসূল (সা.) মুসলমানদের জন্য তিনটি যুদ্ধনীতি প্রণয়ন করে যান। ১. শত্রু নিজ ভূখণ্ডে থেকে আহ্বান করলে তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া। ২. শত্রুর ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য জানা গেলে নিজ ভূখণ্ডে বসে শত্রুর অপেক্ষায় না থাকা; বরং নিজেরা এগিয়ে গিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করা এবং ৩. সার্বক্ষণিক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে থাকা। শত্রুর মাঝে এই উদ্বেগ রাখতে হবে যে, যে কোন সময়ে মুসলমানরা তাদের যুদ্ধের প্রতি আহ্বান করতে পারে অথবা তাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করলে বিদ্যুৎগতিতে মুসলমানরা তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিবে।

॥ একশ এগার ॥

"না, এটা হতে পারে না।" মালিক বিন আওফ নিজ তাঁবুতে বসে ফুঁসে ফুঁসে দু'পা মাটিতে বারবার আঘাত করে এবং বলে—"তারা ঝড়ের বেগে এখানে কিভাবে পৌঁছল? তবে কি আমাদের মধ্যে গাদ্দার আছে, যে অনেক পূর্বেই আমাদের আগমনের খবর তাদের জানিয়ে দিয়েছে?"

"বিশ্বাস না হয় নিজ চোখে গিয়ে দেখে আস মালিক!" বৃদ্ধ দুরায়দ বিন ছম্মাহ বলে—"তোমার চোখ তোমাকে ফাঁকি দিবে না।"

"আমি মিথ্যা বলে থাকলেও খোদ দেবতা লাতের সাথে ধোঁকাবাজি হবে।" "ঐ ব্যক্তি বলে, যে মুসলমানদের সংখ্যা কম-বেশী দশ হাজার বর্ণনা করেছিল এবং এটাও বলেছিল যে, তারা হুনাইনের নিকটে এসে অবস্থান করছে। সে আরো বলে—"তারা তাঁবু স্থাপন করেনি। সদা প্রস্তুতি নিয়ে আছে।...আর একথাও মিথ্যা নয় যে, এ বাহিনীর সেনাপতি খোদ মুহাম্মাদ।"

মালিক বিন আওফ গোসায় ফেটে পড়ছিল বারবার। সে অগোচরে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চলছিল। সে আওতাস থেকে মক্কায় রওনার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু একটু পরেই সে জানতে পারে যে, রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী তাদের অনতিদূরে হুনাইনের কাছে এসে পড়েছে এবং তারা মোকাবেলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

"ক্রোধ তোমার মেধাকে দুর্বল করবে মালিক!" দুরায়দ বলে, "এখন অবরোধ আর অতর্কিতে আক্রমণের চিন্তা মাথা হতে বিদায় কর এবং মুসলমানদের সাথে যেখানে তোমার মোকাবেলা হবে সেখান থেকে ফায়দা লুটতে পার কি-না তার চেষ্টা কর। তুমি কৌশল নির্ধারণে পটু। শত্রুকে প্রতারিত করতে তোমার জুড়ি নেই। তোমার মধ্যে সাহসের কমতি নেই। তাহলে এত পেরেশানীর কি আছে? আমি তোমার পাশে আছি।...আমি তোমাকে আবার বলছি, হাওয়াযিন গোত্র স্ত্রী, পরিবার ও চতুষ্পদ জন্তু সাথে এনে ভাল করেনি।...এস আমার সাথে। হুনাইন উপত্যকা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে পলিসি গ্রহণ করি।"

তারা ঐ এলাকা প্রদর্শনে চলে যায়, যেখানে যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল।

॥ একশ বার ॥

রাসূল (সা.)-এর সাথে আগত মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার। এদের মধ্যে দু'হাজার ছিল মক্কার নব মুসলিম, যারা মাত্র ক'দিন পূর্বে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। অনেকে এই নব মুসলিমদের উপর আস্থা রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌র উপর রাসূল (সা.)-এর সম্পূর্ণ আস্থা থাকায় তিনি তাদেরকেও সাথে নেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.), হযরত ইকরামা (রা.) এবং হযরত সফওয়ান (রা.)-ও নব মুসলিম ছিলেন। এই তিনজনই নেতৃস্থানীয় এবং সেনাপতির যোগ্যতা রাখতেন। নব মুসলিমদের প্রতি এদের প্রভাব ছিল বেশি। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এরা যুদ্ধে নাম লেখায়। এক ঐতিহাসিক লেখেন, তাঁরা মুজাহিদ বাহিনীর জন্য কম-বেশী একশ বর্মের ব্যবস্থা করেছিলেন।

৬৩০ খৃস্টাব্দের ২৭ শে জানুয়ারী ৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল। এ দিন প্রভাতে ১২ হাজার মুসলিম বাহিনী রওনা হয়। ৩১ শে জানুয়ারী বিকেল নাগাদ তারা হুনাইনে গিয়ে পৌছে। যাত্রা ছিল বিদ্যুৎগতির। রাসূল (সা.) ইতিপূর্বেই জেনেছিলেন যে, হাওয়াযিন এবং ছাকীফ গোত্র চরম যুদ্ধবাজ। তাদের নেতা দুরায়দ এবং মালিক বিন আওফের সমরজ্ঞান ও কূটচাল সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। এইজন্য রাসূল (সা.) সর্বাগ্রে বনু সালীমের ৭০০ মুজাহিদকে রাখেন এবং তাদের কমান্ডার নিযুক্ত করেন হযরত খালিদ (রা.)-কে।

মক্কা হতে ১১ মাইল দূরবর্তী একটি উপত্যকার নাম হুনাইন। কোথাও কোথাও উপত্যকাটি বিস্তীর্ণ হতে হতে সাত মাইল দীর্ঘ হয়ে গেছে। আবার কোথাও এর থেকে কম প্রস্থ ছিল। উপত্যকাটি হুনাইনের দিকে যতই এগিয়ে যায় তার প্রশস্ততা ততই কমতে থাকে। হুনাইনের নিকটে গিয়ে এ প্রশস্ততা মাত্র ৪৪০ গজে নেমে আসে। এখান থেকে উপত্যকাটি উপরের দিকে উঠে যায়। কিছুদূর এগিয়ে তা একটি গিরিপথ রূপ নেয়। কখনো বামে মোড় এবং ডানে বাঁক খেয়ে সরু পথটি আরেকটি উপত্যকার সাথে গিয়ে মিলিত হয়। এই বিপজ্জনক স্থানের নাম 'নাখলাতুল ইয়ামানিয়া'। এখানকার পথটি অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল।

মুসলিম বাহিনী গোয়েন্দা মারফৎ খবর রেখেছিল যে, শত্রুপক্ষ আওতাসের নিকটে তাঁবু গেড়ে আছে। কিন্তু রাতের আঁধারের কাছে তারা ধরা খায় অথবা বলা যেতে পারে, তারা এটার কোন প্রয়োজনই অনুভব করে না যে, রাতেও দুশমনের গতিবিধির উপর নজর রাখবে। এর মূল কারণ ছিল, তারা সম্মিলিত বাহিনীর মাঝে রওনা হওয়ার কোন আলামত দেখতে পায় না। ক্যাম্প জুড়ে মৃত্যুর নীরবতা বিরাজ করছিল। কোন তৎপরতা তাদের চোখে পড়ে না।

৬৩০ খৃস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ৮ম হিজরীর ১১ই শাওয়াল প্রত্যূষে মুজাহিদ বাহিনী আওতাসের উদ্দেশে এগিয়ে যায়। পরিকল্পনা ছিল, শত্রু ক্যাম্পে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়া। চোখের ঘুম ফুরাতে না ফুরাতে তাদের টুটি চেপে ধরা। অগ্রযাত্রা সুশৃঙ্খলই ছিল। সর্বাগ্রে বনু সালীমের মুজাহিদ বাহিনী ছিল। এদের কমান্ডার হযরত খালিদ (রা.)। এই হিসেবে হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন সর্বাগ্রে।

ইসলামী বাহিনী ছিল ১২ হাজার। এদের সবাই ছিল সুশৃঙ্খল এবং প্রশিক্ষিত। কিন্তু এই সুশৃঙ্খল বাহিনীর সাথে আরেকটি বিশৃঙ্খল বাহিনীও ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। এরা ছিল মক্কার আশে-পাশের এলাকার। মূল সৈন্যদের সাহায্যার্থে এরা সাথে সাথে গিয়েছিল।

এখানে একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। আর তা হলো, বিশাল এ সেনাবহর দেখে কোন কোন সাহাবী গর্বভরে বলেন, "আজ এমন কে আছে যে আমাদের পরাজিত করতে পারে।" দুই ঐতিহাসিক লেখেন, এই গর্বের মাঝে অহংকারের লেশও ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন সকলের আগে। হুনাইন উপত্যকার সংকীর্ণ স্থানে তিনি যখন প্রবেশ করেন তখন সূর্য সবেমাত্র ঘুম থেকে জাগছিল। হযরত

খালিদ (রা.) দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দেন এবং ঘোড়ার গতি তীব্র থেকে তীব্রতর করেন। হযরত খালিদ (রা.) আবেগতাড়িত যোদ্ধা ছিলেন। নিজের নেতৃত্বের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল। অমুসলিম থাকা অবস্থায় কুরাইশ সর্বাধিনায়ক হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর প্রতি তাঁর যে প্রধান অভিযোগ ছিল তা হচ্ছে, তিনি তাকে স্বাধীনভাবে লড়তে দেননি। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পশ্চাতে এটাও একটি কারণ ছিল যে, তিনি রাসূল (সা.)-এর সৈন্য পরিচালনার মাঝে এক ব্যতিক্রমধর্মী নৈপুণ্য দেখেছিলেন, যা তাকে বড়ই মোহিত করেছিল। হযরত খালিদ (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত ইকরামা (রা.)-কে বলেছিলেন, আমার যুদ্ধাবেগ এবং রণাঙ্গনে আক্রমণাত্মক ভঙ্গির মূল্যায়ন কেবল মুসলমানরাই করতে পারে।

রাসূল (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর সমর-জ্ঞান ও দক্ষতার যে যথেষ্ট মূল্যায়ন করেছিলেন তার বড় প্রমাণ হল, তিনি এই বিশাল বাহিনীর অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন।

॥ একশ তের ॥

সূর্য উদিত হওয়ার সময় হযরত খালিদ (রা.)-এর অগ্রবাহিনী ছিল গিরিপথের সংকীর্ণ স্থানে। আচমকা আসমান-জমিন ফেটে পড়তে শুরু করে। হাওয়াযিন, ছাকীফ ও অন্যান্য গোত্রের সম্মিলিত বাহিনীর উচ্চকিত শ্লোগানে গিরিপথ মুখরিত হয়ে বজ্রধ্বনির ন্যায় কড়াৎ কড়াৎ আওয়াজ ওঠে এবং মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় তীরের ঝাঁক আসতে থাকে। ডান-বামের চত্বর এবং অনতিদূরের পাহাড়-শৃঙ্গ হতে এ সমস্ত তীর ছুটে আসে।

এটা ছিল শত্রুপক্ষের কৌশলী ফাঁদ। মালিক বিন আওফ এবং দুরায়দ বিন ছম্মাহ দিনের বেলায় ক্যাম্পে কোনরূপ তৎপরতা প্রকাশ হতে দেয় না। তাদের নীরবতায় মনে হতে থাকে এটা আদৌ কোন সেনাক্যাম্প নয়। কোন কাফেলার বিরতিশিবির মাত্র। সন্ধ্যার পর মালিক বিন আওফ সৈন্যদেরকে হুনাইনের সংকীর্ণ গিরিপথে নিয়ে যায় এবং তীরন্দাজ বাহিনীকে রাস্তার দু'পার্শ্বের গোপন স্থানে বসিয়ে দেয়।

তীরের বর্ষণ যেমনি অতর্কিত ছিল তেমনি পরিমাণেও ছিল অসংখ্য। মুজাহিদদের অশ্ব তীরাহত হয়ে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে এলোপাথাড়ি হয়ে যায়। যারা তীরের আঘাত থেকে রক্ষা পায় তারাও পিছনে ফিরে আসার চেষ্টা করে। এতে তীরের বর্ষণ আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। অশ্ব ও অশ্বারোহী উভয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। হুলস্থুল পড়ে যায়।

॥ একশ চৌদ্দ ॥

"পালিয়ে যেয়ো না" হযরত খালিদ (রা.) তীর বর্ষার মাঝে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বলছিলেন, "পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না।...মোকাবেলা কর। আমরা শত্রুদেরকে...।" অশ্ব এবং অশ্বারোহীদের হুলস্থুল এমন মারাত্মক ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর আহ্বান কারো কান পর্যন্ত পৌঁছে না। এটা দেখারও কারো ফুরসুৎ ছিল না যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর দেহে মোট কতটি তীর বিদ্ধ হয়েছে। অথচ তিনি সামান্যও পিছু না হঁটে ঐ তীর-বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে স্বীয় বাহিনীকে মোকাবেলার জন্য আহ্বান করছিলেন। পরিশেষে তিনিও পলায়নপরদের ভীড়ে পড়ে যান এবং ভীড় তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে এমনভাবে দূরে এনে ফেলে, যেন কোন তীব্র স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে এনেছে।"

পলায়নপর বাহিনীর বিশাল ধাক্কা একদিকে সরে যায়। হযরত খালিদ (রা.) এত আহত হন যে, তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান এবং বেহুঁশ হয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়েন।

অগ্রগামী বাহিনীর পিছনে মূল বাহিনী আসছিল। এই বাহিনীতে অশৃঙ্খল সেচ্ছাসেবক দলও ছিল। অগ্রগামী বাহিনী হন্তদন্ত হয়ে পিছে পালিয়ে এলে মূল বাহিনীর মাঝেও ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। অগ্রগামী বাহিনীর অনেকের দেহে তীর বিদ্ধ ছিল; তাদের পোশাক ছিল রক্তরঞ্জিত। অশ্বের দেহেও তীরের কমতি ছিল না। মালিক বিন আওফের সৈন্যদের উচ্চকিত শ্লোগান শোনা যাচ্ছিল। এই অবস্থা দেখে মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছে মোড় নেয়।

কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত, যারা আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে না এবং সৈন্যদের সাথে সাথে আসে তারা হুলস্থুলকে এমনভাবে বৃদ্ধি করে যেমন পেট্রোলের সংযোজন আগুনকে বৃদ্ধি করে। তারা নিজেরা শুধু পলায়ন করে না অন্যদের মাঝেও ভীতি ও আতঙ্ক ছড়ায়। তারা দু'কারণে আনন্দিত ছিল। ১. নিজেদেরকে লড়াই থেকে বাঁচাতে পেরেছে এবং ২. মুসলমানরা পলায়নপর; তাদের পরাজয় ঘটেছে।

কিছু সংখ্যক মুসলমান পালিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছে, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। স্থানটি এ শ্রেণীর সৈন্যের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিল। অধিকাংশ পলায়নপর সৈন্য এখানে এসে আশ্রয় নেয়। যারা রণাঙ্গন হতে পালিয়ে ফিরে আসে তাদের সিংহভাগই জানে না, আসল ঘটনা কি? আড্ডাখানায় ফিরে তারা ভাববার অবকাশ পায় যে, আসলে সেখানে কি হয়েছে? আর সে শত্রুরাই বা কোথায়, যাদের ভয়ে সৈন্যরা এভাবে পালাচ্ছে? পলায়নের গতি এত তীব্র ছিল

যে, উটে এবং ঘোড়ায় সংঘর্ষ পর্যন্ত হচ্ছিল। পদাতিকরা এ সমস্ত ঘোড়া এবং উটের পদতলে পিষ্ট হওয়া থেকে বাঁচার জন্য রাস্তার দু'দিকে ছোটাছুটি করছিল।

॥ একশ পনের ॥

রাসূল (সা.) সৈন্যদের এহেন অবস্থা দেখে বিস্ময়ে 'থ' মেরে যান। সৈন্যরা যে রাস্তা দিয়ে ভাগছিল তিনি সে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ান। রাসূল (সা.)-এর সাথে এ সময় নয়জন অশ্বারোহী ছিলেন। উল্লেখযোগ্য চারজন হলেন ঃ ১. হযরত উমর (রা.); ২. হযরত আব্বাস (রা.); ৩. হযরত আলী (রা.) এবং ৪. হযরত আবু বকর (রা.)।

"মুসলমানগণ!" রাসূল (সা.) জোর আওয়াজে আহ্বান করতে শুরু করেন—"কোথায় চলেছ তোমরা? আমি এদিকে দাঁড়ানো।...আমি আল্লাহ্‌র রাসূল বলছি।...আমার দিকে লক্ষ্য কর। আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ এখানে দাঁড়ানো।"

মুসলমানরা বিদিক হয়ে রাসূল (সা.)-এর পাশ দিয়েই ভাগতে থাকে। রাসূল (সা.)-এর আহ্বান কারো কানে পৌঁছে না। হযরত খালিদ (রা.)-কে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। তিনি ওদিকে কোথাও বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। এ সময়ে হাওয়াযিন গোত্রের কতিপয় লোককে উট এবং ঘোড়ায় চেপে পলায়নপর মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনে আসতে দেখা যায়। তাদের সামনে এক উষ্ট্রারোহী ছিল। শত্রুপক্ষের পতাকা ধারণ করে রেখেছিল সে। হযরত আলী (রা.) এক মুসলমানকে সাথে নেন এবং ঐ উষ্ট্রারোহীর পিছু দৌড় দেন। নিকটে গিয়ে হযরত আলী (রা.) ঐ উটের পিছনের পায়ে তলোয়ার চালিয়ে পা কেটে ফেলেন। উট কাত হয়ে পড়ে গেলে আরোহীও দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে। হযরত আলী (রা.) আরোহীকে সোজা হয়ে বসার সুযোগ দেন না। ধড় থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ করে দেন।

রাসূল (সা.) একটি টিলার উপর গিয়ে দাঁড়ান। এ সময় শত্রুপক্ষের কেউ তাঁকে চিনতে পেরে চিৎকার করে বলে ওঠে—"ঐ যে মুহাম্মাদ...তাঁকে হত্যা কর।" এ আহ্বান শুনে ছাকীফ গোত্রের কিছু লোক ঐ টিলায় উঠতে থাকে যেখানে রাসূল (সা.) দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাদের উপর একযোগে আক্রমণ করেন। সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষে তারা রণে ভঙ্গ দেয়। তাদের একজনও রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় না।

"মালিক বিন আওফের কাছে আমি পরাজিত হব না।" রাসূল (সা.) বলেন—"এত সহজে সে কি করে বিজয় লাভ করতে পারে!"

রাসূল (সা.) বিক্ষিপ্ত এবং দিক-বিদিক হয়ে ছোটাছুটিরত সাহাবায়ে কেরামকে দেখেন। শত্রুপক্ষের তৎপরতাও গভীরভাবে খেয়াল করেন। তিনি নিজ সৈন্যদের চেয়ে বিপক্ষের সৈন্যদের গতি ও অবস্থান নিরীক্ষণ করতে থাকেন। রাসূল (সা.) সমর জ্ঞানের আলোকে অনুভব করেন যে, প্রথম পর্যায়ে সফল হওয়ায় মালিক এত খুশী যে, পরবর্তী চালের কথা তার মাথায় আসেনি। ইসলামী বাহিনীর বিক্ষিপ্ততা এবং এলোপাথাড়ি পলায়ন থেকে সে পুরোপুরি ফায়দা লুটতে পারেনি। সমরকুশলী হিসেবে মালিকের বিশেষ খ্যাতি থাকায় রাসূল (সা.) স্বাভাবিকভাবে ধরে নিয়েছিলেন যে, একটু পরেই মালিক বাহিনী মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করতে আসবে। কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনে আগত সৈন্যসংখ্যা যেমনি ছিল কম, তেমনি তা সুশৃঙ্খলও ছিল না।

রাসূল (সা.) অগ্রবর্তী বাহিনীকে পিছু হঁটে আসতে দেখেছিলেন। মোট কতজন শহীদ বা আহত হয়েছে তারও একটি ধারণা নিয়েছিলেন। রাসূল (সা.)-কে জানানো হয় যে, কয়েকটি অশ্ব এবং তার আরোহী তীর বিদ্ধ হয় মাত্র। একজনও শহীদ হয়নি। এ তথ্য হতে রাসূল (সা.) অনুমান করতে সক্ষম হন যে, শত্রুরা তীরন্দাজীতে অপরিপক্ক এবং তারা তাড়াহুড়োর শিকার। তারা দক্ষ এবং বিচক্ষণ হলে এত তীরের মাঝে একজনেরও বাঁচার কথা ছিল না।

রাসূল (সা.) পাশে দাঁড়ানো সাহাবায়ে কেরামের প্রতি নজর বুলান। হযরত আব্বাস (রা.)-এর প্রতি তাঁর চোখ আটকে যায়। হযরত আব্বাস (রা.)-এর স্বর অস্বাভাবিক উচ্চ ছিল। অনেক দূর-দূরান্ত হতে শোনা যেত। দৈহিক দিক দিয়েও তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন।

"আব্বাস!" রাসূল (সা.) বলেন—"তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক! মুসলমানদের ডাকো। তাদেরকে এখানে আসতে বল।"

"আনসার ভায়েরা!" হযরত আব্বাস (রা.) সর্বোচ্চ আওয়াজে ডাকতে শুরু করেন—"মদীনাবাসী!...মক্কার জনতা!...এস...আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে এস।" হযরত আব্বাস (রা.) বিভিন্ন গোত্র এবং বিশেষ লোকদের নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, রাসূলের কাছে এস। আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে এস।

সর্বপ্রথম আনসাররা আসে। তাদের সংখ্যা সামান্য ছিল। কিন্তু একে অপরকে দেখে এগিয়ে আসতে থাকে। মক্কার অন্যান্য গোত্রের কিছু লোকও আসে। মোট মিলে একশজনের মত হয়। এ সময় পিছু হটা মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনে অনেক হাওয়াযিনদের আসতে দেখা যায়। রাসূল (সা.) সমবেত একশ সাহাবীকে আগত হাওয়াযিনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন।

মুজাহিদ বাহিনী পিছন থেকে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাওয়াযিনের লোকেরা থতমত খেয়ে যায়। তারা আক্রমণ সামাল দেয়ার চেষ্টা করে কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী তাদের সে সুযোগ দেয় না। অধিকাংশই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। নিহত এবং আহতরা পড়ে থাকে শুধু।

॥ একশ ষোল ॥

আকস্মিক একটি বাঁধার সম্মুখীন হওয়ায় সাময়িকের জন্য মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল মাত্র। ইতিপূর্বে তারা প্রতিপক্ষ হতে কয়েক গুণ কম সৈন্য নিয়েও বীর বিক্রমে লড়াই করেছে এবং বিজয়ের মুকুট ছিনিয়ে এনেছে। মুজাহিদগণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়ার পর যখন দেখে যে, হযরত আব্বাস (রা.)-এর আহ্বানে মুসলমানরা রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে জড়ো হচ্ছে এবং শত্রুরা মুসলমানদের এক ক্ষুদ্র দলের পাল্টা হামলায় টিকে থাকতে না পেরে পালিয়ে গেছে এবং তারা এটাও দেখে যে, হাওয়াযিন ও ছাকীফরা তাদের পশ্চাদ্ধাবনে আসছে না তখন কয়েক হাজার মুজাহিদ রাসূল (সা.)-এর কাছে ফিরে আসে। রাসূল (সা.) দ্রুত তাদের মাঝে শৃঙ্খলা বিধান করে যুদ্ধের সাজে বিন্যস্ত করেন এবং শত্রুর উপর আক্রমণের নির্দেশ দেন।

হযরত খালিদ (রা.) লাপাত্তা ছিলেন। উদ্বেগ আর টেনশনে কারো মাথায় এই খেয়াল আসে না যে, একটু খোঁজ নিয়ে দেখবে, কে কোথায় এবং কিভাবে আছে।

যে সংকীর্ণ গিরিপথে এক সময় মুজাহিদদের উপর বজ্র ভেঙ্গে পড়েছিল এখন সে স্থানটিই সম্মিলিত শত্রু-বাহিনীর জন্য মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়। হাওয়াযিন গোত্র সবচে দুর্ধর্ষ হওয়ায় তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে সামনে রাখা হয়। সন্দেহ নেই যে, তারা ভীষণ যুদ্ধবাজ ছিল। কিন্তু মুসলমানদের বজ্র হামলার সামনে তারা টিকতে পারে না। মুসলমানরা সর্বোচ্চ বীরত্ব প্রকাশের মাধ্যমে ঐ ভীতিবোধও নিরসন করতে চায়, একটু ভুলের কারণে যার সম্মুখীন ইতিপূর্বে তাদের হতে হয়েছিল।

এটা ছিল সরাসরি লড়াই। মুসলমানরা তরবারী চালনায় এমন চমক সৃষ্টি করে যে, হাওয়াযিনদের লাশ একের পর এক পড়তে থাকে। আর তাদের অধিকাংশ পলায়নের চেষ্টা করছিল। রাসূল (সা.) রণাঙ্গনের নিকটবর্তী একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পবিত্র জবানে বার বার ধ্বনিত হচ্ছিল ঃ

"আমি সত্য নবী; কোন সন্দেহ নেই,

আমি আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র; কোন ভুল নেই।"

হাওয়াযিন মার খেয়ে শুধু পিছনে হঁটতে থাকে। তারা আক্রমণাত্মক পজিশন থেকে রক্ষণাত্মক অবস্থায় চলে আসে। তাদের সাহসের ফানুস ক্রমেই চুপসে আসছিল। তাদের পশ্চাতে ছাকীফ গোত্রের সৈন্যরা প্রস্তুত ছিল। মালিক বিন আওফ চিৎকার করে করে হাওয়াযিনদের পিছে সরিয়ে নেয়। ছাকীফ গোত্রের তাজাদম ও নতুন বাহিনী দ্রুত হাওয়াযিনদের শূন্যস্থান পূরণ করে। মুসলমানরা ক্লান্ত কিন্তু বনু ছকীফ সতেজ। শুরু হয় আবার অগ্নিপরীক্ষা। শক্তি এবং ক্লান্তির বিচারে মুসলমানদের পাল্লা নিম্নগামী থাকলেও রাসূল (সা.)-এর উপস্থিতি এবং তাঁর উৎসাহ-প্রেরণা মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং ক্লান্তি দূর করে তাদের মাঝে দৃঢ়তা ও জিহাদী জোশ সরবরাহ করেছিল।

মুসলমানদের তলোয়ার ও বর্শার আঘাতে যে বজ্র ও বিদ্যুৎ ছিল এবং তাদের নারাধ্বনি ও উচ্চকিত শ্লোগানে যে গর্জন ও হুঙ্কার ছিল ছাকীফ গোত্রের উপর তা ভয়াবহ ত্রাস সৃষ্টি করে। ছাকীফের যুদ্ধবাজ সৈন্যদের বিশেষ যুদ্ধ-খ্যাতি থাকলেও তাদেরকে দ্রুত পিছু হঁটতে দেখা যায়। এক সময় তাদের উট ও ঘোড়া নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এতে শত্রু-শিবিরে ঐ তাণ্ডব সৃষ্টি হয়, যা প্রভাতে গিরিপথে মুসলমানদের মাঝে হয়েছিল। ইতিপূর্বে হাওয়াযিনরা শোচনীয়ভাবে পিছু হঁটেছিল। এবার ছাকীফদেরও পিছু হঁটতে দেখে অন্যান্য ক্ষুদ্র গোত্রগুলোর মনোবল যুদ্ধ ছাড়াই হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে। তারা জীবন বাঁচাতে এলোপাথাড়ি পালিয়ে যায়।

মালিক বিন আওফ সংকীর্ণ রাস্তার অদূরে হাওয়াযিনের দলছুট সৈন্যদের সমবেত করছিল। তার অবস্থা বলছিল, সে আক্রমণাত্মক অবস্থান থেকে ফিরে নিজ বাহিনীকে আত্মরক্ষামূলক প্রাচীরে পরিণত করতে সৈন্য বিন্যস্ত করছিল।

রাসূল (সা.) মালিকের এই সৈন্যবিন্যাস দেখে দ্রুত নিজ সৈন্যদের কাছে আসেন। তিনি দেখতে পান যে, সকালে যারা গিরিপথের শিকার হয়ে আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল তারাও ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে। রাসূল (সা.) অশ্বারোহীদের সামনে আসতে বলেন। মুহূর্তে অশ্বারোহী বাহিনী পদাতিক বাহিনী হতে পৃথক হয়ে যায়। তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে বিন্যস্ত করে নির্দেশ দেন যে, হাওয়াযিনদেরকে সামলে নেয়া এবং সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না। বিদ্যুৎ গতিতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়।

এ অশ্বারোহী বাহিনীতে বনু সালীমের ঐ সকল অশ্বারোহীও ছিল, গোপন স্থান থেকে যাদের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম তীরের ঝাঁক এসেছিল। আর সে তীর বর্ষণে মুসলমানদের সংঘবদ্ধতা ছিন্ন-ভিন্ন এবং লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তাদের সাথে পূর্বের কমান্ডার ছিলেন না। তিনি ছিলেন হযরত খালিদ (রা.)। তিনি তখনও কোথাও বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন।

এবার এ অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব অর্পণ করা হয় হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রা.)-এর স্কন্ধে। রাসূল (সা.) তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, সামনের গিরিপথটি মালিক বিন আওফের কব্জায়। তাকে ওখান থেকে বেদখল করে ছাড়বে।

রাসূল (সা.) নতুন করে আবার যুদ্ধের লাগাম হাতে তুলে নেন। তাঁর ইশারায় হযরত যুবাইর বাহিনী টর্নেডো গতিতে গিয়ে হাওয়াযিন বাহিনীতে আঘাত হানে। তাঁর বাহিনীর তলোয়ারে বিদ্যুতের স্ফূরণ ঘটতে থাকে। ফলে হাওয়াযিনের স্তম্ভিত ও হতবিহ্বল বাহিনী বেশীক্ষণ টিকতে পারে না। পড়িমরি করে সবাই গিরিপথ ছেড়ে চলে যায়। গিরিপথটি বেশ দীর্ঘ ছিল। রাসূল (সা.) যুবাইর বাহিনীকে গিরিপথে অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে বলেন, এখন থেকে এটাই হবে আমাদের যুদ্ধক্যাম্প।

রাসূল (সা.) কালক্ষেপণ না করে আরেকটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত করেন। কমান্ডার নিযুক্ত করেন হযরত আবু আমের (রা.)-কে। রাসূল (সা.) তাঁকে আওতাসের নিকটে অবস্থিত সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণ করার দায়িত্ব প্রদান করেন।

"খালিদ...খালিদ এখানে" অনেক দূর থেকে একজন আওয়াজ দিয়ে বলে "এখানে সে পড়ে আছে।"

রাসূল (সা.) এক প্রকার দৌড়ে হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে গিয়ে পৌছান। তখনও তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। রাসূল (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর ভূলুণ্ঠিত শরীরের পাশে বসে পড়েন এবং তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফুঁ দেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর চক্ষু উন্মিলিত হয়। রাসূল (সা.) হযরত খালিদের খোলা চোখে দীর্ঘক্ষণ চক্ষু স্থাপন করেন। একটু পরেই হযরত খালিদ (রা.) উঠে বসেন। তার দেহে বিদ্ধ তীরের আঘাত গভীর ছিল না। দ্রুত তীর বের করে ব্যান্ডেজ বেধে দেয়া হয়।

"আল্লাহ্‌র রাসূল!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "আমি লড়ব। আমি এখন লড়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।"

রাসূল (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর দেহ ও আত্মায় জাদু ভরে দিয়েছিলেন। তিনি তাকে বলেন, যুবাইরের বাহিনীতে শরীক হয়ে যাও। কমান্ড দেয়ার মত স্বাভাবিক অবস্থা তোমার মাঝে এখনও ফেরেনি।

হযরত খালিদ (রা.) তৎক্ষণাৎ একটি ঘোড়ায় চেপে বসেন। তার বস্ত্র ছিল রক্ত-রঞ্জিত। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুত হযরত যুবাইর (রা.)-এর বাহিনীতে গিয়ে শরীক হন। তিনি হযরত যুবাইর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, এখন করণীয় কি? হযরত যুবাইর (রা.) তাঁকে জানান যে, আওতাসের নিকটবর্তী হাওয়াযিনের তাঁবুতে আক্রমণ করা। কিন্তু এ আক্রমণের নেতৃত্ব দিবেন হযরত আবু আমের (রা.)।

আওতাস হুনাইন উপত্যকা হতে যথেষ্ট দূরে ছিল। মালিক বিন আওফ হাওয়াযিন বাহিনীকে এই আওতাস পর্যন্ত পিছে সরিয়ে নিয়ে যায়। তাদেরকে সেনাক্যাম্পের আশে-পাশে ছড়িয়ে দেয়। প্রতিরোধ দেয়াল হিসেবে মালিক তাদেরকে এভাবে ক্যাম্পের চতুর্দিকে এনে দাঁড় করায়। কারণ, ক্যাম্পের মধ্যে ছিল সৈন্যদের হাজার হাজার স্ত্রী, সন্তান এবং চতুষ্পদ জন্তু। হাওয়াযিন গোত্র আসার সময় এসব সাথে করে নিয়ে আসে। মালিক এই বুঝে তাদের সাথে আনতে উদ্বুদ্ধ করে যে, এদের সামনে দেখলে সৈন্যরা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করবে। কিন্তু তার এ সিদ্ধান্ত বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়। এখন এরাই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অভিজ্ঞ দুরায়দ বিন ছম্মাহ মালিককে এই বলে বকাবকি করতে থাকে যে, বারবার তার নিষেধ ও সতর্ক করা সত্ত্বেও মালিক কেন তাদের আনল। এই নারী, শিশু ও গৃহপালিত জন্তুর প্রাণ রক্ষা করাই এখন তাদের জন্য দায় হয়ে পড়েছে। মুসলমানদের হাত থেকে কিভাবে এদের রক্ষা করবে—এটাই জটিল প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়।

॥ একশ সতের ॥

হযরত আবু আমের (রা.)-এর বাহিনী আওতাস অভিমুখে চলছে। ক্যাম্পের কাছে পৌঁছলে হাওয়াযিনরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যুদ্ধজয় কিংবা *মুসলমানদের লণ্ডভণ্ড করে মক্কা অধিকারের জন্য লড়ে না;* বরং মুসলমানদের হাত থেকে নিজেদের স্ত্রী, পুত্র, পরিজন এবং চতুষ্পদ প্রাণী রক্ষার জন্য লড়ে।

এটাও ছিল আরেকটি তীব্র রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এখানে যুদ্ধ-কৌশল অর্থহীন। বীরত্ব এবং বাহাদুরীর জয়জয়কার ছিল। অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী লড়তে লড়তে পুরো উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

হযরত আবু আমের (রা.) একাই শত্রুপক্ষের নয় অশ্বারোহীকে মরণপুরে পাঠান। কিন্তু দশম শত্রুর হাতে নিজে শহীদ হয়ে যান। রাসূল (সা.) পূর্বেই হযরত আবু আমের (রা.)-এর স্থলবর্তী নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই হযরত আবু মুসা (রা.)। তিনি তৎক্ষণাৎ দায়িত্ব বুঝে নেন এবং নিজ বাহিনীর প্রেরণা বৃদ্ধি করতে থাকেন।

হাওয়াযিনরা প্রথমে প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করলেও এখন তারা গাছের পাকা ফলের মত টুপটাপ পড়ে যেতে থাকে। তাদের নিহত ও আহতের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। তাদের মন্দ পরিস্থিতি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এদিকে রাসূল (সা.) হযরত যুবাইর (রা.)-এর ঐ বাহিনীকে দ্রুত হযরত আবু মুসা (রা.)-এর বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে যেতে বলেন, যাদেরকে তিনি গিরিপথ সংরক্ষণে সেখানে রিজার্ভ রেখেছিলেন। হাওয়াযিনের পরাজয় দ্রুত ঘটাতে রাসূল (সা.) যুবাইর বাহিনীকে প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

হযরত যুবাইর (রা.) তাঁর বাহিনীকে আক্রমণে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলে ছন্দময় দ্রুতগতিতে ঘোড়া অশ্বারোহীকে নিয়ে ছুটতে থাকে। এ সময় হযরত খালিদ (রা.)-এর অশ্ব ছিল সকলের আগে আগে।

হাওয়াযিনের মনোবলে আগে থেকেই চিড় ধরেছিল। মুসলমানদের নতুন এই বাহিনীর বজ্রাঘাত তারা সহ্য করতে পারে না। ইতিপূর্বেই তাদের আহতদের সংখ্যা বিপুল পর্যায়ে পৌঁছেছিল। দুই অশ্বারোহী ইউনিটের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিপাকে হাওয়াযিনের ব্যূহ ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়। তারা স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ছেড়ে পালাতে শুরু করে। রাস্তা পরিষ্কার হলে মুসলিম বাহিনী অনায়াসে তাদের সেনাক্যাম্প ঘিরে ফেলে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রের যোদ্ধারা হাওয়াযিন এবং ছাকীফের মত শক্তিশালী গোত্রকে পালাতে দেখে তারা ক্ষণিকের জন্যও সেখানে দেরী করে না। যুদ্ধ-বাতাস দেহে না লাগতেই তারা রণাঙ্গন হতে সটকে পড়ে এবং সোজা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে আসে। মালিক বিন আওফকে রণাঙ্গনের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। নিজ শহর তায়েফ রক্ষার চিন্তা

তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। সে শেষ দিকে এসে তার গোত্রের অন্যান্য নেতাদের বলেছিল, মুসলমানরা যে গতি এবং যে প্রেরণা নিয়ে আসছে, তা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, তারা তায়েফে যাবে এবং সেখানকার এক একটি ইট খুলে ফেলবে। এই আশঙ্কাকে সামনে রেখে সে ছাকীফ গোত্রের সমস্ত বাহিনীকে কৌশলে যুদ্ধ থেকে পৃথক করে নেয় এবং তায়েফে গিয়ে দম ফেলে।

মালিক বিন আওফ যখন তায়েফ রক্ষায় ব্যস্ত অপরদিকে হুনাইন প্রান্তরে তখন কেয়ামতের বিভীষিকা চলছিল। হাওয়াযিনের স্ত্রী-সন্তানদের গগনবিদারী চিৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। পুরো হুনাইন উপত্যকা মুসলমানদের কব্জায় চলে আসে। মক্কা হতে আগত বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আহত মুজাহিদদের তুলে নিয়ে যায়। আহত শত্রুরা মাটিতে পড়ে কাতরাতে থাকে। অনেকে ধুকে ধুকে মরছিল। মৃত্যুবরণকারীদের মাঝে বৃদ্ধ দুরায়দ বিন ছুম্মাহও ছিল। সে বৃদ্ধ হলেও জাতির ক্রান্তিকালে কাঁপা হাতে তলোয়ার উঠিয়ে নেয় এবং লড়তে লড়তে মারা যায়।

গনীমতস্বরূপ মুসলমানরা আহত এবং বন্দী শত্রুদের থেকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র এবং ঘোড়া লাভ করে। এ ছাড়া ৬ হাজার নারী-শিশু, ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার বকরী এবং প্রচুর রৌপ্য তাদের হস্তগত হয়।

মুসলমানরা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। কিন্তু রাসূল (সা.) এখনই তাদের বিজয় উদ্‌যাপন করতে দেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, মালিককে দম ফেলার এবং সৈন্য সুসংগঠিত করার সুযোগ দেয়া হবে না। তিনি প্রকারান্তরে এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিপজ্জনক সাপের মাথা থেতলে দিতে চান। রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে গনীমতলব্ধ নারী-শিশু, চতুষ্পদ জন্তুসহ অন্যান্য সম্পদ একটি বাহিনীর মাধ্যমে যা'আরানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদের সেখানেই অবস্থান করতে বলা হয়। পরের দিনই রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে ইসলামী বাহিনী তায়েফ পানে অগ্রসর হয়। এখানে ঘোরতর সংঘর্ষের আশঙ্কা ছিল।

হুনাইন যুদ্ধের মৌলিক বিবরণ পবিত্র কুরআনের সূরা তওবায় উল্লেখিত হয়েছে। কতক সাহাবা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে মন্তব্য করেছিলেন; 'আজ আমাদের পরাজিত করার মত কে আছে? এই বিশাল শক্তির মোকাবেলা কে করতে পারে।' সূরা তাওবার বিবরণ ঃ

"আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।...

"তারপর আল্লাহ্ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা। তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের কর্মফল।" (সূরা তওবা ঃ ২৫-২৬)

সমাপ্ত

দৃষ্টি আকর্ষণ

☞ যারীদ কে? তার জন্যে ইউহাওয়ার মন কাঁদে কেন? সে কি পারবে যারীদের দুঃখ ঘুচাতে? সাধ পূরণ করতে?

☞ এক এক করে নয়টি তলোয়ার ভেঙ্গে গেল এ কোন বীর মুজাহিদ? পনের হাজারেরও অধিক সৈন্যের সাথে মাত্র তিন হাজার মুসলিম বাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে। পারবে কি এই অপরাজেয় মুজাহিদ শত্রুপক্ষ হটিয়ে মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করতে? কিন্তু কি ভাবে?

☞ মরুঝড়ের কবলে পড়ে ইউহাওয়া ঘোড়ার গাড়ী থেকে বিস্তীর্ণ মরুভুমিতে ছিটকে পড়ে। একদিকে মরু সাইমুম অপর দিকে মরুঘূর্ণিপাক ক্রমে তাকে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দেয়। পারবে কি এ রহস্যময় নারী মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাতে? কার সাহায্যে সে ফিরে যাবে স্বীয় নীড়ে।

☞ মদীনা হতে মক্কা যাবার গিরিপথটি অত্যন্ত দুর্গম। কিন্তু উমরা পালনেচ্ছুক কাফেলাটি এ স্থান অতিক্রম করার পূর্বেই দু'শত দুর্ধর্ষ শত্রু এর আসে পাশে এসে ওঁৎ পেতে থাকে। কি করবে এখন কাফেলা? মদীনা ফিরে যাবে নাকি শত্রুর পাতা ফাঁদে পা দেবে?

☞ মরুশিয়াল এবং শকুন টেনে হিঁচড়ে ফিরছে এ কোন হতভাগা নারীর লাশ ? এটা কি নিছক হত্যাকান্ড নাকি ভাগ্যের নির্মম পরিণতি? তার এ করুণ পরিণতির জন্যে দায়ী কে? রাতের নিস্তব্ধতা খান-খান করে পাহাড়-পর্বতে কার আর্তচিৎকার ভেসে আসছে? প্রেতাত্মার না মানবের ? কেন সে এ ভাবে চিৎকার করে ফিরছে ?

☞ হুসাইন উপত্যকায় ওঁৎ পেতে রয়েছে ওরা কারা ? আকস্মিক গুপ্তহামলায় পর্যদুস্ত মুসলিম বাহিনী কি আবার যুদ্ধে ফিরে আসতে পারবে ? কিন্তু অগ্রবর্তী বাহিনীর কমান্ডার কোথায় ? তিনি শহীদ না আহত ?

এ সমস্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব নিয়ে এসেছে নাঙ্গা তলোয়ার -২

মাকতাবায়ে এমদাদিয়া
পাঠক বন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১-৩৭৮৫৩৩